POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

আহমদীয়া সংবাদ

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 28-29

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা ৬০০ টাকা

বৃহস্পতিবার 9-16 July 2026 23-1 সফর 1448 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অনুবাদ: "হে যাহরা ঈমান আনিয়াছ! তেমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। (আনফাল: ২৮)

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا

অনুবাদ: এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাহাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী। (সূরা নিসা: ১০৮)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

বিশ্বাসভঙ্গ বা খেয়ানত করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ". غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ: وَإِنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে সে পূর্ণ মুনাফিক। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এর একটি বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে:

১. যখন তাকে কোন আমানত দেওয়া হয়, সে তাতে খিয়ানত করে।
২. যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে।
৩. যখন সে কোন অঙ্গীকার বা চুক্তি করে, তা ভঙ্গ করে।
৪. যখন সে ঝগড়া করে, তখন অশ্লীল ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে।"

[(সূত্র: সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়: মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যসমূহ (বাব বয়ান খিসালিল মুনাফিক)]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

বিশ্বস্ততা রক্ষার মাঝেই মানুষের (আধ্যাত্মিক) সৌন্দর্য নিহিত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "প্রত্যেক মুমিনের অবস্থাও এমনই। যদি সে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আল্লাহর হয়ে যায়, তবে মহান আল্লাহ নিজেই তার অভিভাবক হয়ে যান। কিন্তু যদি তার ঈমানের ভিত্তি পচে যায়, তবে অবশ্যই সে বিপদের মধ্যে থাকে। আমরা কারও অন্তরের অবস্থা জানি না; অন্তরের গোপন বিষয় একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে মানুষ নিজের অসততার কারণেই ধরা পড়ে। যদি কারও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্বচ্ছ না হয়, তবে বাইআত বা অন্য কিছুই তার কোনো উপকারে আসবে না। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষ সুরক্ষা দান করেন। যদিও তিনি সকলেরই আল্লাহ, তবুও যারা নিজেদেরকে তাঁর জন্য বিশেষ করে তোলে, তাদের ওপর তিনি তাঁর বিশেষ মহিমা প্রকাশ করেন। আর আল্লাহর জন্য বিশেষ হওয়ার অর্থ হলো-নিজের নফস বা অহংকারকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা, যেন তার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে।

এজন্যই আমি আমার জামাআতকে বারবার বলি: যদি তোমাদের অন্তর পবিত্র না হয়, তবে কখনোই তোমাদের বাইআত নিয়ে গর্ব করো না। হৃদয় যদি দূরে থাকে, তবে কেবল হাতে হাত রাখলে কী লাভ? যখন অন্তর ও জিহ্বার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তখন আমার হাতে হাত রেখে তারা এক প্রকার মুনাফিকসুলভ ঘোষণা করে। অতএব স্মরণ রেখো, এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ শাস্তির যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এই অঙ্গীকার করে, তার বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তাকে এক নতুন জীবন দান করা হয়।"

(মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃ. ৬৫; আল-হাকাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩)**

এরপর অন্য এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন: "মানুষের সৃষ্টিতে দুই ধরনের সৌন্দর্য রয়েছে। একটি হলো আচরণগত সৌন্দর্য (হুসনে মুআমালাহ)। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার অর্পিত সকল আমানত ও অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে একজন মানুষ যেন তার সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী এমন যত্নবান হয় যে কোনো দিকেই অবহেলা না হয়। আল্লাহর বাণীতে ব্যবহৃত 'রাউন' শব্দটি এই দিকেই ইঙ্গিত করে। একইভাবে, আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি অর্পিত আমানত ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রেও একই রকম যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ, একজন মানুষের উচিত আল্লাহর হক (হুকূকুল্লাহ) এবং মানুষের হক (হুকূকুল ইবাদ)-উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়া। এটিই আচরণগত সৌন্দর্য, বা অন্য কথায়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য।"

(বরাহীন-এ-আহমদিয়া, অংশ ৫-এর পরিশিষ্ট, পৃ. ২১৮)

বিশ্বস্ততা রক্ষার বিষয়ে খোদাভীতি অবলম্বন করা উচিত

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

মির্যা বশীর-উদ্দীন মাহমুদ হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.) সূরা আল-বাকারার ২৮৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন:

"যদি তোমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের প্রতি আস্থা রাখে, তবে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে, সে যেন সেই আমানত যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয় এবং সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।"

যদি তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট ও আস্থাশীল হয়ে কোনো বন্ধক বা জামানত ছাড়াই তাকে অর্থ প্রদান করে, তবে যার কাছে সেই অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং যাকে বিশ্বস্ত বলে বিশ্বাস করা হয়েছে, তার কর্তব্য হলো, অপর ব্যক্তি যখন তা চাইবে তখন কোনো ধরনের অজুহাত বা বিলম্ব না করে সেই অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। এখানে ঋণকে আমানত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো, পৃথিবীতে মানুষ সাধারণত আমানত ফেরত দেওয়াকে অবশ্য কর্তব্য মনে করে। কিন্তু ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অনেক সময় মানুষ অযথা উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করে। তাই বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে ঋণও এক ধরনের আমানত। এই আয়াত থেকে আমরা সব ধরনের আমানত রক্ষা করা এবং যথাসময়ে তা ফিরিয়ে দেওয়ার একটি সাধারণ শিক্ষাও লাভ করি। পবিত্র কুরআন অন্য এক স্থানে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে:

"আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করে।"

এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সামাজিক ও পারস্পরিক লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো নিজের সম্পদ অন্যের কাছে আমানত হিসেবে রাখা। তাই শুধু ঋণের ক্ষেত্রেই নয়, আমানতের ক্ষেত্রেও আল্লাহভীতি অবলম্বন করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, আমানতের মালিক যখন তার আমানত ফেরত নিতে আসে, তখন তোমরা নানা অজুহাত ও বিলম্ব করতে শুরু কর।

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪৮-৬৪৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর উত্তরের আলোকে

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব

জমজমের পানি সম্পর্কে

প্রশ্ন: ভারতের কেরালার এক বন্ধু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.) (আল্লাহ্? তাঁকে সাহায্য করুন)-এর নিকট লিখেছিলেন যে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সিরাত খাতামুন নাবিয়্যিন-এ লিখেছেন, ফেরেশতা তাঁর গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করায় ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত প্রশ্নকারী সর্বদা পড়ে এসেছেন যে, হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁর পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে ঝর্ণা উৎসারিত হয়। তিনি এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করেছিলেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের চিঠিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্আল খামিস (আই.) নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হুজুর বলেন:

উত্তর: এ বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই। উভয় বর্ণনাই হাদিসের গ্রন্থসমূহে, ইতিহাস গ্রন্থে, জীবনীগ্রন্থ (সীরাত) এবং কুরআনের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে।

এতে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা তাঁর গোড়ালি দিয়ে অথবা ডানা দিয়ে মাটি খুঁড়লে সেই স্থানে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, অধ্যায়: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - "আর আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন)।

এটিও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) তীব্র তৃষ্ণায় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে সেখান থেকে ঝর্ণা উৎসারিত হয়। (তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২৭২, দার ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ২০০১ সাল, সুরা ইবরাহীম, আয়াত ৩৮-এর তাফসীর; আল-কামিল ফীত তারীখ, মুহাম্মদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী, মৃত্যু ৬৩০ হিজরী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮০, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৭১)।

যেহেতু প্রাচীন উৎসসমূহে উভয় প্রকার বর্ণনা বিদ্যমান, তাই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাহিত্যেও উভয় দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে কবীরের এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন:

"ফেরেশতা বললেন, 'হে হাজেরা, যাও এবং দেখো যে, ইসমাইলের পায়ের নিচে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন।'

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৩, যুক্তরাজ্য সংস্করণ, ২০২৩)।

অন্যত্র তিনি বলেন:

"ইসমাইল নামটি 'সামি'আ' (শোনা) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা শ্রবণ করবেন। সেই অনুসারে হযরত ইসমাইল তাঁর পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন এবং ঝর্ণা উৎসারিত হলো।"

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৪, যুক্তরাজ্য সংস্করণ, ২০২৩)।

এবং আপনি আপনার চিঠিতে যেমন উল্লেখ করেছেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সিরাত খাতামুন নাবিয়্যিন-এ এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন:

"যখন হাজেরার যন্ত্রণা চরমে পৌঁছালো, তখন সপ্তম চক্র সম্পন্ন করে তিনি এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন যে, 'হে হাজেরা! আল্লাহ্? তোমার এবং তোমার সন্তানের আর্তনাদ শুনেছেন।' এই কণ্ঠস্বর শুনে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, একজন ঐশী ফেরেশতা সেই স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে শিশুটি তীব্র তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ছটফট করছিল। ফেরেশতা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিলেন যেন কিছু খনন করছেন। হাজেরা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ফেরেশতা যেখানে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করছিলেন সেখানে এক ঝর্ণা রয়েছে, যা থেকে প্রচুর পানি উৎসারিত হচ্ছিল।"

(সিরাত খাতামুন নাবিয়্যিন, পৃষ্ঠা ৭৫)।

সুতরাং, এই ঘটনা সম্পর্কে উভয় প্রকার বর্ণনাই পাওয়া যায়। এই বর্ণনাসমূহ থেকে এটাও অনুমিত হয় যে, হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) যেখানে তীব্র তৃষ্ণার কারণে তাঁর গোড়ালি দিয়ে আঘাত করছিলেন, সেটিই ছিল সেই স্থান যেখানে ফেরেশতাও তাঁর গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করেছিলেন এবং উভয়ের গোড়ালির আঘাতের স্থান থেকেই ঝর্ণা উৎসারিত হয়েছিল।

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।

দরুদ শরীফ সম্পর্কে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত me©v সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

প্রশ্ন: কানাডার এক বন্ধু হযরত খলীফাতুল মসীহ্আল খামিস (আই.)-এর নিকট লিখে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি দোয়ার সঠিক অর্থ ও গুরুত্ব এবং দরূদ শরীফ (পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের চিঠিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্আল খামিস (আই.) নিম্নরূপ উত্তর দেন। হুজুর বলেন:

উত্তর:সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি দোয়াটি আল্লাহ্ তা'আলার পরম পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করে। এর অনুবাদ হলো:

"আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসা ও মহিমা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তাঁরই উপযুক্ত।"

হাদিসে এই দোয়ার অপরিসীম ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সেই অনুসারে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"দুটি বাক্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এগুলো জিহ্বার উপর খুব হালকা (অর্থাৎ উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ), কিন্তু কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় খুব ভারী হবে। এই বরকতময় বাক্য দুটি হলো:

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি; সুবহানাল্লাহিল আযীম।

('আল্লাহ্র প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি; আল্লাহ্, যিনি মহান, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।')

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, অধ্যায়: আল্লাহ্?র তাসবীহ পাঠের ফযীলত)।

এছাড়া, হযরত মসীহ্ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কেও ঐশী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে একটি দোয়া শেখানো হয়েছিল যাতে দুরূদ শরীফ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন:

"যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কতিপয় নবীকে বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া শিখিয়েছিলেন, তেমনি তিনি আমাকেও ইলহামের মাধ্যমে একটি দোয়া শিখিয়েছেন এবং তা এই:

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ।"

(তির্যাকুল কুলুব, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ২০৮, পাদটীকা)।

নির্ধারিত দুরূদ শরীফ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি দোয়া, যাতে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর তাঁর রহমত ও বরকত প্রার্থনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এটি পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেন:

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা তাঁর উপর দরূদ পাঠ করো এবং সালামের অভিবাদন জানাও।" (সুরা আল-আহযাব ৩৩:৫৭)।

এই নির্ধারিত দরূদের অনুবাদ:

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর রহমত নাযিল করো এবং মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উপর রহমত নাযিল করেছিলে এবং ইবরাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত প্রশংসিত, অত্যন্ত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বরকত নাযিল করো এবং মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উপর বরকত নাযিল করেছিলে এবং ইবরাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত প্রশংসিত, অত্যন্ত মহিমান্বিত।"

দুরূদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ("হে আল্লাহ্, মুহাম্মদের উপর রহমত নাযিল করো) এবং আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ("হে আল্লাহ্, মুহাম্মদকে বরকত দান করো) বাক্যাংশ দুটির অর্থ আমি বিভিন্ন জুমার খুতবা ও ভাষণে ইতোমধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। এখানে সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ-এর অর্থ:

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.)-কে দুনিয়াতে মর্যাদা দান করো - তাঁর স্মরণকে উন্নত করে, তাঁর বাণীর সাফল্য ও বিজয় দান করে এবং তাঁর শরীয়তকে স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা প্রদান করে। আখিরাতে তাঁকে সম্মানিত করো - তাঁর উম্মতের পক্ষে তাঁর সুপারিশ কবুল করে এবং তাঁর প্রতিদানকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে।"

আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ-এর অর্থ: "হে আল্লাহ্! পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য তুমি যে সম্মান, মহত্ত্ব, উন্নত মর্যাদা ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছো, তা তাঁর জন্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাকে চিরস্থায়ী ধারাবাহিকতা দান করো। তা চিরকাল অটুট থাকুক।"

সারকথা, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ হলো পবিত্র নবীর শরীয়তের বিজয় ও চিরস্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং উম্মতের তাঁর সুপারিশ থেকে উপকৃত হওয়ার দোয়া। আর আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ হলো তাঁর সম্মান, মহত্ত্ব, উন্নত মর্যাদা ও মর্যাদা যাতে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে সে সম্পর্কিত দোয়া। (এর পর ১৬ পাতায়....)

জুমআর খুতবা

বিনয় সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ মে , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৫ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা এ কথায় পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখি যে, পৃথিবীতে যদি কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর মতো কোনো কামেল মানব তাঁর (সা.) পূর্বেও জন্মগ্রহণ করে নি, আর পরেও জন্মগ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান আর সকল উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং যাবতীয় মানবিক গুণাবলির সর্বোচ্চ সকল মার্গ মহানবী (সা.) অতিক্রম করেছেন। যে-কোনো চারিত্রিক গুণের কথাই ধরুন না কেন- এর সর্বোচ্চ মার্গ তাঁর মাঝে দেখা যায়। এটি অন্য কোনো মানুষের মাঝে ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এসব গুণ ও চরিত্রের মধ্যে একটি হলো বিনয় ও নম্রতার বৈশিষ্ট্য, যার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর (সা.) সত্তায় দেখা যায়। নিজের মান্যকারীদেরকেও তিনি (সা.) সর্বদা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মু'মিনের উচিত সর্বদা বিনয়ের বৈশিষ্ট্যকে নিজের জীবনের অংশে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করা।

মহানবী (সা.)-এর এই সুমহান চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (সূরা আল-কাহ্ফ:১১০) "তুমি তাদের বলে দাও, আমি তো কেবল তোমাদের মতোই একজন মানুষ।"আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সর্বশেষ এবং কামেল শরীয়ত আনয়নকারী নবীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তারপরও তাঁর (সা.) মাধ্যমে এই ঘোষণাই করিয়েছেন যে, বলে দাও, আমি একজন মানুষ এবং একজন দুর্বল বান্দা। যাহোক, এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যার মাধ্যমে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর (সা.) এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের নবী করীম (সা.) অপেক্ষা কোনো কামেল মানবের আদর্শ পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা হতেও পারে না। এরপর দেখো! অলৌকিক মু'জিযা লাভের পরও মহানবী (সা.)-এর সার্বক্ষণিক অবস্থা ছিল (খোদা তা'লার) দাসত্ব। তিনি (সা.) বিনয়ী মানুষ ও বিনয়ী বান্দা হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করেছেন আর বারংবার এ কথাই বলতেন, قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তো কেবল তোমাদেরই মতো একজন মানুষ)। এমনকি তওহীদের কলেমায় নিজের দাসত্বের স্বীকৃতিকে অত্যাবশ্যকীয় দিক আখ্যায়িত করেছেন, যা ব্যতীত কোনো মুসলমান মুসলমানই হতে পারে না। চিন্তা করো এবং ভেবে দেখো! যেখানে কামেল পথপ্রদর্শকের আচরিত জীবন আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, নৈকট্যের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হয়েও নিজের দাসত্ব ও বন্দেগির স্বীকৃতি বিসর্জন দেন নি, সেখানে অন্য কারো এমনটি ধারণা করা এবং অন্তরে এমন কথার উদ্রেক হওয়া সম্পূর্ণ অহেতুক ও নিরর্থক।"

(রিপোর্ট জলসা সালানা, ১৮৯৭, পৃ: ৪০)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, বৃথা আস্ফালন এবং অনর্থক অহংকার ও বড়াই পরিহার করা উচিত এবং বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা উচিত। দেখো! মহানবী (সা.)- যিনি প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড়ো এবং মাহাত্ম্যের যোগ্য অধিকারী ছিলেন, তাঁর বিনয় ও নম্রতার একটি দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। লেখা আছে, একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। একদিন তাঁর (সা.) কাছে মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি (সা.) তাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। আলোচনায় ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় সেই দৃষ্টিহীন ব্যক্তি উঠে চলে যায়। এটি একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে একটি গোটা সূরা অবতীর্ণ করেন। তখন মহানবী (সা.) তার বাড়ি যান এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এসে নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তাকে বসান।

আসল কথা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য থাকে, তাদেরকে অবশ্যই বিনয়ী ও নম্র হতে হয়, কারণ তারা সর্বদা খোদার অমুখাপেক্ষিতার কারণে ভীতসন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত থাকেন।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড,পৃ: ২৯৮)

কাজেই, এটি কেবল পবিত্র কুরআনের বা মসীহ্ মওউদ বর্ণিত কেবল একটি ঘটনাই নয়, বরং এটি একটি শিক্ষা যা আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ; যদি তাঁকে ভালোবাসার দাবি করো তাহলে তোমরাও বিনয় এবং নম্রতার সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো।

মহানবী (সা.) একজন মু'মিনকে বিনয়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং এর ওপর আমল করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন; মহানবী (সা.) বলেন: প্রত্যেক মানুষের মাথার সাথে দুটি শিকল বাঁধা রয়েছে। একটি শিকল আকাশের দিকে এবং অপরটি ভূমির দিকে। যখন বান্দা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, তখন সেইফেরেশতা যার হাতে আকাশের দিকের শিকলটি রয়েছে, সে তাকে টেনে ওপরের দিকে তুলে নেয়। বান্দা বিনয়ের কারণে নীচে ঝুঁকে গেলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ওপরের মর্যাদা দান করেন, আর যখন সে অহংকার ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তখন ভূমির দিকের শিকলটি তাকে নীচের দিকে টেনে নেয়।"

(আল জামিও লি শোয়বিল ঈমান, লিল বাইহাকি, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৬)

অহংকারীর কোনো কর্ম গ্রহণযোগ্য হয় না, সে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়, ভূপাতিত হয় বা মাটিতে পড়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন বিনয় অবলম্বন করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করে দেন।

(কুনজুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪৯, হাদীস-৫৭১৭)

কাজেই, আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহলে এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে 'বিনয়' (অবলম্বন)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সদকা দিলে সম্পদে কোনো ঘাটতি হয় না। আর কেউ যদি মার্জনা করে তাহলে আল্লাহ্ তার সম্মানই বৃদ্ধি করেন, অর্থাৎ ক্ষমা করলে সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

(জামি তিরমিযি, আবওয়াবুর বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-২০২৯)

অতএব, একজন মু'মিনের জন্য এসব নীতিগত কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সদকা এবং আর্থিক কুরবানীর ফলে সম্পদ কমে যায় না বরং বৃদ্ধি পায়; তাই এই সন্দেহ মন থেকে দূর করে দাও যে, আর্থিক কুরবানীর কারণে তোমাদের সম্পদে কোনো ঘাটতি দেখা দেবে। ক্ষমা ও মার্জনা করলে সম্মান কমে না বরং সম্মান বাড়ে। লোকেরা যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান এবং সামাজিক বিরোধের নিস্পত্তি হয়ে যাবে। এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, আর বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তা'লা উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তোমরা যত বেশি বিনয়ী হবে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ততটাই সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

মহানবী (সা.)-এর নিজের বিনয়ের মান কেমন ছিল!

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির সর্বোত্তম সন্তান! তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকসকল! তাকওয়া বা খোদাভীরুতাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্, আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসুল। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তোমরা তা অতিরঞ্জিত রূপে বর্ণনা করবে- এটি আমি পছন্দ করি না।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯৪, হাদীস-১২৫৭৯)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) দ্বারা যে ঘোষণা করিয়েছেন, নিজের বাস্তব আদর্শের মাধ্যমেও তিনি (সা.) এর প্রমাণ দিয়েছেন।

এরপর তাঁর (সা.) বিনয়ের পরাকাষ্ঠার আরেকটি দৃষ্টান্ত হাদীসে দেখা যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ কথা

বলতে শুনেছি যে, কারও কর্ম কখনোই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনাকেও নয়? তিনি (সা.) বলেন, না, আমাকেও নয়; তবে যদি আল্লাহ্ আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ এবং রহমত দ্বারা আবৃত করে নেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। তাই যে কাজই করবে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে করবে এবং তা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন কখনো মৃত্যু কামনা না করে; যদি সে পুণ্যবান হয় তবে হতে পারে– সে পুণ্যের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করবে, আর যদি সে মন্দ হয় তবে হতে পারে– সে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মারজা, হাদীস-৫৬৭৩)

এরপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, মিসকীনদেরকে ভালোবাসবে, কেননা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাঁর দোয়ায় একথা বলতে শুনেছি যে: اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ- অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখো এবং মিসকীন হিসেবে মৃত্যু দিয়ো আর মিসকীনদের দলেই আমাকে পুনরুত্থিত কোরো।

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জোহদ, হাদীস-৪১২৬)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অজস্র ধারায় যিকর করতেন এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হতেন না, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিকর খুব বেশি করতেন। নামায দীর্ঘ করতেন এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত দিতেন। তিনি (সা.) বিধবা ও মিসকীনদের সাথে চলতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে কোনো প্রকার সংকোচ বা দ্বিধাবোধ করতেন না।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুল জুমআ, হাদীস-১৪১৫)

ইবাদতের উচ্চ মার্গ তো ছিলই, কিন্তু বিনয় ও নম্রতার চিত্র হলো, যে-কোনো মিসকীন এবং বিধবার কথা শোনার জন্য পূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তাদেরকে সময় দিতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, মদীনার বাসিন্দাদের দাসীদের মধ্য থেকে একজন দাসীও নিজের প্রয়োজনে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৬০৭২)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক মহিলা যার বোধবুদ্ধি কিছুটা কমছিল– সে একদা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনার সাথে আমার কাজ আছে। তিনি (সা.) বলেন, হে অমুকের মা! দেখো, তুমি যে গলিতেই চাও আমাকে নিয়ে চলো, যতক্ষণ না আমি তোমার কাজ করে দিই। এরপর তিনি (সা.) তার সাথে একটি রাস্তায় গেলেন যতক্ষণ না সে তার কাজের কথা জানাল এবং তা করিয়ে নিল; অর্থাৎ তার যে দাবি ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম কিতাবুল ফাজাইল, হাদীস-৪২৭৯)

যাইহোক, রেওয়ায়েতে এই মহিলার নাম উম্মে যাফর বর্ণিত হয়েছে যিনি হযরত খাদিজা (রা.)-এর সেবিকা ছিলেন এবং বুদ্ধিতে কিছুটা খাটো বা দুর্বল ছিলেন, অর্থাৎ খুব একটা বুদ্ধিমতী ছিলেন না, সামান্য দুর্বলতাও হয়ত ছিল; কখনো কখনো এমন মানুষও থাকে যারা কথা বুঝতে পারে না, ভালো বোধবুদ্ধি থাকে না। এমন নয় যে, আল্লাহ্ না করুন– তিনি মানসিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু যা-ই হোক, ততটা বুদ্ধিমতীও ছিলেন না। কিন্তু মহানবী (সা.) তারও আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (আল কাওকাবুল ওয়াহাজ, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৫৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আদী বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং মদীনায় পৌঁছলাম; আর মসজিদে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি নিবেদন করলাম, আমি আদী বিন হাতিম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমাকে তাঁর ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। পথিমধ্যে একজন দুর্বল বৃদ্ধা মহিলা এল এবং সে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর (সা.) কাছে নিজের কোনো প্রয়োজনের কথা বলল। মহানবী (সা.) তার খাতিরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি (আদী) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই ব্যক্তি বাদশা হতে পারে না। বাদশারা তো এভাবে গরিবদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। রাজাদের মাঝে এমন শিষ্টাচার থাকে না। এরপর মহানবী (সা.) আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং একটি মোটা গদি উঠিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, এর ওপর বসো। ঘরে একটি কুশনের মতো পড়ে ছিল, তা তিনি এই মেহমানকে দিয়ে দিলেন। আমি নিবেদন করলাম, আপনিই এতে বসুন। তিনি (সা.) বলেন, না, তুমি বসো। অবশেষে আমি এর ওপর বসলাম এবং তিনি (সা.) মাটিতে বসলেন। আমি মনে মনে বললাম, এই আচরণ কখনোই বাদশাদের মতো নয়। এগুলো তো অত্যন্ত বিনয়ী মানুষের বৈশিষ্ট্য। (আসসীরাতুন নববিয়াহ, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৫৪)

তিনি (সা.) শিশুদের সাথেও স্নেহ ও বিনয় প্রকাশ করতেন। তাদেরকে আগে সালাম দিতেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারের কাছে গেলে তাদের শিশুদেরকে সালাম করতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।

(আসসুনানুল কুবরা লিন নিসাঈ, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৮৩৪৯)

(হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং তিনি (সা.) তার সাথে কথা বলেন, আর হুযূর (সা.)-এর প্রতাপের কারণে তার কাঁধ কাঁপতে থাকে। তিনি (সা.) তাকে বলেন, শান্ত হও! আমি কোনো রাজা নই; আমি তো এমন এক নারীর সন্তান যে শুকনো মাংস খেত।

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমা, ৩৩১২)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখো, আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সাফল্যসমূহ যদিও এমন ছিল যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর মাঝে এর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) যতই সাফল্য দান করেছেন, তিনি (সা.) ততটাই বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করেছেন। একবারের ঘটনা, এক ব্যক্তিকে হুযূর (সা.)-এর সামনে ধরে আনা হয়; তিনি (সা.) দেখলেন, সে খুব কাঁপছে এবং ভয় পাচ্ছে। কিন্তু যখন সে কাছে এল তখন তিনি (সা.) অত্যন্ত নম্রতা এবং স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমিও তোমারই মতো একজন মানুষ এবং এক বৃদ্ধার সন্তান।"(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২১৭-২১৮)

বাহ্যিক আড়ম্বর ও কৃত্রিমতারও তিনি (সা.) অনেক উর্ধ্বে ছিলেন।

এর প্রকাশ তাঁর (সা.) মদীনায় হিজরতের সময়ের একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। আমরা তা অনেকবার শুনেছি। যেমনটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনায় হিজরতের সময় যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আসেন তা শোনামাত্রই মুসলমানরা উঠে নিজেদের হাতিয়ারের দিকে ছোটে এবং 'হাররা' প্রান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে ডান দিকে মোড় নেন এবং বনু আমর বিন অওফের মহল্লায় তাদের কাছে আসেন আর এটি ছিল সোমবার এবং রবিউল আউয়াল মাস। হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ান আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরবে বসে থাকেন; আর আনসারের মধ্যে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে (আগে) দেখে নি তারা এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর রোদ পড়তে লাগে। হযরত আবু বকর (রা.) ওঠেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর ওপর নিজের চাদর দিয়ে ছায়া করেন। তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চিনতে পারে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৯০৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন; তিনি (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কোরো না, যেভাবে খ্রিষ্টানরা মরিয়ম-পুত্রের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র বান্দা; সুতরাং তোমরা এ কথাই বলো যে, (আমি) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল।

(সহীহ বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৪৪৫)

অনুরূপভাবে আলী বিন হাসান (রা.) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইসলামের ভালোবাসার কারণে ভালোবাসো। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেছেন, 'আমার প্রকৃত মর্যাদার চেয়ে আমাকে বড়ো করো না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে রসুল বানানোর পূর্বে নিজের বান্দা বানিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, ইসলামের

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Waseya Begum, Harhari (Murshidabad)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

ভালোবাসার কারণে ভালোবাসো। (আল মুজামুল কাবীর, লিত তিবরানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮-১৩৯)

মুতাররিফ বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা বলেছেন, আমি বনু আমেরের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমরা নিবেদন করি, আপনি আমাদের নেতা। তিনি (সা.) বলেন, প্রকৃত নেতা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। আমরা নিবেদন করি, আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনুগ্রহ করার দিক থেকে আমাদের সবার চেয়ে মহান। তিনি (সা.) বলেন, কাজের কথা বলো; অথবা তিনি বলেন, শয়তান যেন তোমাদের উদ্ধত করে না তোলে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৮০৬)

এটিই ছিল তাঁর (সা.) বিনম্রতার মান। তিনি তখনই থামিয়ে দেন যে, এসব কথা বাদ দাও; পাছে এগুলো পরে তোমাদের মধ্যে স্থায়ী রূপ ধারণ করে। তোমাদের আসল যে উদ্দেশ্য, যে জন্য এসেছ- তা বর্ণনা করো এবং আমার ব্যাপারে ভুল কথা বোলো না; যদিও তাঁর জন্য যে-সব প্রশংসামূলক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা বৈধ ছিল।

হযরত রবীয়া বিনতে মুআউভিয বিন আফরা বলতেন, যখন আমার রুখসতানা (কন্যাবিদায়) হলো, তখন মহানবী (সা.) আমার ঘরের ভেতরে এলেন এবং আমার বিছানায় সেভাবে বসলেন যেভাবে তুমি আমার কাছে বসে আছো। যার কাছে তিনি বর্ণনা করছিলেন, তাকে তিনি এটি বলেছিলেন। যাহোক, সেই সময় আমাদের কিছু মেয়ে 'দফ'(এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজাতে শুরু করে এবং আমার পরিবারের সেসব বুযুর্গের প্রশংসা করতে থাকে যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। আর সেসব কবিতার মধ্যে একটি মেয়ে বলে, আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কী ঘটবে। তিনি (সা.) তখনই বলেন, এটি বাদ দাও এবং সেটিই গাও যা আগে গাইছিলে।(সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-৫১৪৭)

এ কথাগুলো ভুল যে, আমি অদৃশ্যের খবর জানি; গায়েবের সংবাদ কেবল আল্লাহ্ তা'লা জানেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কারো (এ কথা) বলা উচিত নয়- আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিজে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ তুলনা করতে নিষেধ করেছেন এবং পরম বিনয় প্রকাশ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৬০৩)

একইভাবে হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে খায়রুল বারিয়্যা অর্থাৎ হে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি! এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তিনি তো ইবরাহীম (আ.) ছিলেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৪৩৫৩)

নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) খায়রুল বারিয়্যা ছিলেন ও আছেন এবং তিনিই সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, রসুলদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তিনি পরম বিনম্রতাবশত এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আরোপ করেন।

তাঁর বিনয়ের একটি উদাহরণের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়- হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে তিনবার ডাকে এবং প্রতিবারই তিনি (সা.) বলেন, লাব্বাইক, লাব্বাইক (অর্থাৎ আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত)।

(মজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফোয়ায়েদ,হাদীস-১৪২২৪)

যখন প্রায় পুরো আরব জয় হয়ে গেল, তখন এই আরব-বিজেতা এক লাখেরও বেশি সাহাবীর সাথে হজ্জ পালন করেন এবং সেই সময় তাঁর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন!

হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হজ্জ করেছিলেন একটি সাধারণ হাওদা বিশিষ্ট উটের ওপর চড়ে এবং এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে যার মূল্য ছিল চার দিরহামের সমান, বরং তার চেয়েও কম ছিল; অর্থাৎ খুব সাধারণ একটি চাদর ছিল। আর তিনি (সা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! এমন হজ্জ হোক, যাতে কোনো লোক-দেখানো ভাবও থাকবে না এবং সুনামের আকাঙ্ক্ষাও থাকবে না।

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস-২৮৯০) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড-৩, পৃ:৩৬১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর নামের প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি করতে গিয়ে বলেন, 'আহমদ' নামটি হলো 'জামাল' তথা সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং এর বিপরীতে 'মুহাম্মদ' নামটি হলো 'জালাল' তথা প্রতাপের বিকাশ। মহানবী (সা.)-এর দুটি নাম। এর কারণ হলো, 'মুহাম্মদ' নামের মধ্যে প্রেমাস্পদ হবার রহস্য নিহিত। অর্থাৎ তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন, কেননা তিনি সমস্ত প্রশংসার সমাহার ও পরম পর্যায়ের সৌন্দর্য। আর সমস্ত প্রশংসার সমাহার হওয়া প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত প্রশংসার সমষ্টি, আর সমস্ত প্রশংসার সমাহার তখনই হয় যখন আল্লাহ্ তা'লার মহিমাও তাঁর ওপর প্রকাশ পায় এবং তিনিও তা প্রকাশ করেন; আর আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁর সেই উচ্চ মর্যাদাও যেন প্রকাশ পায়। কিন্তু 'আহমদ' নামের মধ্যে প্রেমিকসুলভ রহস্য রয়েছে। এতে প্রেমিকসুলভ রং সুপ্ত আছে, কারণ প্রশংসাকারী হবার জন্য বিনয়, প্রেমিকসুলভ বিনয় ও নম্রতা অপরিহার্য, একেই জামালী অবস্থা বলা হয়। 'আহমদ' নামটি দ্বারা সৌন্দর্যময় অবস্থা এ কারণে বুঝানো হয় যে, এতে প্রেম-ভালোবাসার দিক বিদ্যমান এবং এই অবস্থা নম্রতা ও বিনয়ের দাবি রখে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের নবী (সা.)-এর মধ্যে প্রেমাস্পদের মহিমাও ছিল; মুহাম্মদ নামের দাবি এটিই ছিল। অর্থাৎ মুহাম্মদ নামই এ বিষয়ের দাবি করে যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ছিলেন। কারণ 'মুহাম্মদ' তথা সকল প্রশংসার সমাহার হওয়া প্রেমাস্পদ হবার মর্যাদা সৃষ্টি করে। মহানবী (সা.) এর মধ্যে প্রেমিকসুলভ মহিমাও ছিল, যা আহমদ নাম দাবি করে থাকে। অর্থাৎ আহমদ নামের দাবি হলো- তাঁর (সা.) মাঝে ভালোবাসার যোগ্যতাও থাকবে, কেননা একজন প্রশংসাকারীর জন্য প্রেমিক হওয়া আবশ্যক। কারণ একজন ব্যক্তি কারো সত্যিকারের প্রশংসা তখনই করে যখন সে তার প্রেমিক হয়। আর প্রেমিক হওয়ার জন্য বিনয় থাকা অপরিহার্য। কারও প্রেমে পড়তে হলে নম্রতা দেখাতে হয়, ভয় ও প্রতাপ প্রদর্শন করে প্রেম প্রকাশ করা যায় না। আর এটাই সেই জামালী বা কোমল অবস্থা যা আহমদ নামের অপরিহার্য বাস্তবতা। মুহাম্মদ নামের মধ্যে যে প্রেমাস্পদসুলভ বিশেষত্ব ছিল তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। আর যারা অবমাননাকারী ও হত্যাকারী ছিল, আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার প্রতাপ তাদের দমন করেছিল।" (আরবাঈন নং-৪, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ:৪৪৭-৪৪৮) তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র প্রিয় ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতাপ ও মহিমা প্রকাশ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতাপের প্রকাশ ঘটিয়ে শত্রুদের চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন।

এর আরো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, তাঁর (সা.) পবিত্র নামগুলোর মধ্যে একটি গোপন রহস্য হলো- মুহাম্মদ এবং আহমদ এই নাম দুটির পৃথক পৃথক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মুহাম্মদ নাম প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রশংসার দাবি করে, অর্থাৎ যার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। এর মধ্যে এক ধরনের প্রেমাস্পদসুলভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ প্রেমাস্পদের প্রশংসা করা হয়ে থাকে। তাই এতে প্রতাপের বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কিন্তু আহমদ নামের মধ্যে প্রেমিকসুলভ দিক রয়েছে, কারণ প্রশংসা করা প্রেমিকের কাজ; সে তার প্রিয়ভাজন ও প্রেমাস্পদের প্রশংসা করতে থাকে। তাই যেভাবেমুহাম্মদ নাম প্রেমাস্পদ হিসেবে প্রতাপ ও মাহাত্ম্য চায়, তেমনি আহমদ নাম প্রেমিকসুলভ অবস্থায় দারিদ্র্য, বিনয় ও নম্রতার দাবি রাখে। এই দ্বিতীয় নাম আহমদ-এর মাধ্যমে বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ পায়। এর মধ্যে নিহিত আরেকটি রহস্য হলো, মহানবী (সা.)-এর জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। একটি ছিল মক্কার জীবন- যা ছিল তেরো বছর দীর্ঘ, আর অন্যটি ছিল মদীনার জীবন- যা ছিল দশ বছরের। মক্কার জীবন আহমদ নামের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সেই সময় তাঁর দিন-রাত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহজারি, ক্রন্দন,সাহায্যপ্রার্থনা এবং দোয়ায় অতিবাহিত হতো। বিনয় ও নম্রতার পরম বহিঃপ্রকাশের সাথে ছিল এর সম্পর্ক। যদিও পরবর্তী জীবনেও এই অবস্থাই ছিল, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে কেবল এই গুণটিই প্রকাশ পাচ্ছিল। সেসময় কীভাবে তাঁর সময় অতিবাহিত হতো- কেউ যদি তাঁর (সা.) সেই মক্কার জীবনের সময়কাল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়, তবে সে বুঝতে পারবে যে, তিনি (সা.) মক্কার জীবনে যে পরম কাকুতিমিনতি করেছেন, তা কোনো প্রেমিক তার প্রিয়জনের সন্ধানে কখনো করে নি এবং করতেও পারবে না। আল্লাহ্ তা'লার প্রেমেযেভাবে তিনি (সা.) সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়েছিলেন- সেটির উদাহরণ এখানে তিনি (আ.) বর্ণনা করছেন যে, যদিও তাঁর (সা.) সমস্ত জীবনই এ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বিশেষভাবে সেই যুগে এটিই প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু তাঁর (সা.) আকুতি ও কান্না নিজের জন্য ছিল না, বরং তা পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার কারণে ছিল। কারণ আল্লাহ্‌র ইবাদতের নামনিশানাও তখন প্রায় মুছে গিয়েছিল, আর তাঁর (সা.) আত্মা ও প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমানের মাধ্যমে এক বিশেষ আনন্দ ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বভাবতই তিনি এই পরম আনন্দ ও ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীবাসীকে সিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপরদিকে যখন তিনি পৃথিবীর (শোচনীয়) অবস্থা অবলোকন করতেন, যখন তাদের সামর্থ্য ও প্রকৃতির মাঝে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং তারা অনেক কষ্ট ও নানামুখী বিপদাপদের সম্মুখীন ছিলেন। মোটকথা, পৃথিবীর এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি এমন আহাজারি করতেন যে, প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হতো। এই অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,'লাআল্লাকা বাখিউন্নাফসাকা আল-লা ইয়াকুন মোমিনুন' (সূরা শু'আরা: ৪) অর্থ: হয়ত তুমি এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে যে, তারা কেন ঈমান আনছে না? এটি ছিল তাঁর কাতর জীবনের চিত্র এবং এর (জীবনের) মাঝে 'আহমদ' নামের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সে সময় তিনি এক মহান লক্ষ্যে মগ্ন ছিলেন। এই লক্ষ্যের পূর্ণ বিকাশ মদীনার জীবনে এবং 'মুহাম্মদ' নামের প্রকাশের সময়কালে হয়েছিল, যেমনটি এই আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায়; সেটি প্রাথমিক যুগ

ছিল অর্থাৎ 'আহমদ' নামের জীবন ছিল, আর মদীনায় আগমনের পর 'মুহাম্মদ' নামের জ্যোতির্বিকাশ ঘটে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেও শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, সেই নামের (মুহাম্মদ) প্রকাশের সময় হয়েছিল যেরূপ এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (সুরা ইবরাহীম: ১৬) (মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃ:৬২-৬৩)

আর তারা বিজয়ের জন্য দোয়া করলেন এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী ও সত্যের বিরোধী শত্রু ব্যর্থ ও নিষ্ফল হলো। মদীনায় এসেও যখন শত্রুরা কঠোরতা প্রদর্শন করল, তখন আবারও 'মুহাম্মদ' নাম বিকশিত হলো এবং প্রত্যেক শত্রু ধ্বংস হয়ে গেল। وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ তারা বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন, আর আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ওপর বিজয় দান করলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে দিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও এক স্থানে বলেন:

বিনয় ও নম্রতায় মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরম রূপে দেখা যায়, সেখানে বুঝা যায় যে, তিনি ফেরেশতাদের সাহায্য ও জ্যোতিতে ততটাই সাহায্যপ্রাপ্ত ও আলোকিত ছিলেন। যেমন আমাদের নবী করীম (সা.) নিজের ব্যবহারিক ও কর্মময়অবস্থার মাধ্যমে তা (প্রকাশ করে) দেখিয়েছেন। এমনকি তাঁর নূর ও কল্যাণের পরিধি এতটাই ব্যাপক ছিল যে, চিরকাল পর্যন্ত তারই দৃষ্টান্ত ও প্রতিফলন দেখা যায়। চিরকাল এই দৃষ্টান্তই পরিলক্ষিত হবে। সুতরাং এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লার যত কল্যাণরাজি ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হচ্ছে, তা তাঁরই অনুগত্য ও তাঁরই অনুসরণে লাভ হচ্ছে।

আমি সত্য বলছি এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি- কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ প্রকৃত সৎকর্মশীল ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভকারী গণ্য হতে পারে না এবং সেসব অনুগ্রহ, কল্যাণ, তত্ত্বজ্ঞান, সত্য ও দিব্যদর্শনের কল্যাণ লাভ করতে পারে না যা উচ্চমানের আত্মশুদ্ধির কারণে লাভ হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণে নিজেকে পূর্ণরূপে বিলীন করে দেয়। এর প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম (কুরআন) থেকেই পাওয়া যায়, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সুরা আলে ইমরান: ৩২)

অর্থ: তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবেআমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব ও জীবন্ত নিদর্শন আমি নিজেই।"

তিনি (আ.) বলেন, আমি এই প্রুতিশ্রুতির বাস্তব প্রমাণ। আমি নবী করীম (সা.)-কে ভালোবাসি এবং আল্লাহ্‌র কল্যাণরাজি আমার ওপর নাযিল হচ্ছে। আল্লাহ্‌র কুরআনে তাঁর প্রিয় বান্দা ও অলীদের জন্য যে নিদর্শন নির্ধারিত আছে, সেই নিদর্শনের মাধ্যমেই আমাকে শনাক্ত করো। মোটকথা, মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা এমন যে, কোনো বৃধ্বাও যদি তাঁর হাত ধরে ফেলতেন, তাৎক্ষণিক তিনি সসম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। যতক্ষণ না বৃধ্বা নিজে তাঁকে ছেড়ে দিতেন, তিনি তার হাত ছাড়তেন না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:১৮৮-১৮৯)

একটি রেওয়ায়েতে তাঁর (সা.) বিনয় ও সরলতার বিষয়টি এভাবে বিদ্যমান-

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোগীর খোঁজখবর নিতেন, জানাযার নামাযে উপস্থিত হতেন, আর গাধার ওপরও আরোহণ করতেন; সাধারণ বাহন থাকলে তাতেও আরোহণ করতেন। ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতেন। আর বনু কুরাইযার যুদ্ধের দিন তিনি (সা.) গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন, যার লাগাম ছিল খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি রশি, আর সেটির ওপর খেজুরের ছালের জিন বাঁধা ছিল। অন্য কথায়, অত্যন্ত সাদামাটা ছিল। (জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল জানায়েজ, হাদীস-১০১৭)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমান (রা.) একটি খুতবায় বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সফরেও এবং আবাসে মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছি। তিনি (সা.) আমাদের অসুস্থদের দেখতে যেতেন, আমাদের জানাযার সাথে যেতেন, সর্বত্র সকল কাজে আমাদের সাথে থাকতেন। (মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৬, হাদীস-৫০৪)

একইভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে যদি ছাগলের একটি পায়া খাওয়ার জন্যও নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় তাহলে আমি সেই নিমন্ত্রণ অবশ্যই গ্রহণ করব। আর যদি ছাগলের একটি পায়া আমাকে উপহারস্বরূপ পাঠানো হয় তাহলে আমি সেটি অবশ্যই গ্রহণ করব। অর্থাৎ সামান্য ও সাধারণ কোনো নিমন্ত্রণ হোক বা উপহার হোক- তিনি (সা.) তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। (সহীহ বুখারি, কিতাবুল হিবাহ, হাদীস-২৫৬৮)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.)-কে যবের রুটি ও পুরাতন চর্বির দাওয়াতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি (সা.) সানন্দে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৬১০-৬১১, হাদীস-১৩৫৩১

একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর সাধারাণ খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়- হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন এক দর্জি মহানবী (সা.)-কে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ দেন, যা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমিও সেই নিমন্ত্রণে যাই। মহানবী (সা.)-এর সামনে তিনি রুটি ও ঝোল উপস্থাপন করেন যার মাঝে লাউ ও মাংসের টুকরো ছিল। লাউ ও মাংসের তরকারি ছিল। মহানবী (সা.)-কে দেখি, তিনি পাত্রের যেখানে লাউ ছিল, সেখান থেকে নিচ্ছিলেন এবং মাংস বাদ দিচ্ছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, আমি সেদিন থেকেই লাউ খাওয়া শুরু করে দিলাম। আমি লাউ পছন্দ করতে লাগলাম।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুইয়ূ, হাদীস-২০৯২)

এখানে আমি আমাদের মেহমানদের জন্যও একটি কথা বলে দিচ্ছি, এখানে তাদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কেননা লঙ্গারে বিশেষ করে জলসার দিনগুলোতে কখনো কখনো লোকেরা আপত্তি করে থাকে যে, আমাদের আলু-মাংসের তরকারি থেকে শুধু আলু দেবেন না, মাংস দেবেন। মহানবী (সা.)-এর এই যে আদর্শ- তা সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখুন। খাবার তো হিসাব করে রান্না করা হয়, এজন্য যা পাওয়া যায় তা থেকেই খাওয়া উচিত। আর যে সবজি বা মাংসই দেওয়া হয়, তা সানন্দে খাওয়া উচিত।

এরপর আবেগ-অনুভূতির বিষয়ে সংবেদনশীলতা এবং বিনয়াবনতার একটি দৃষ্টান্ত একটি বর্ণনায় এভাবে পাওয়া যায়- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরেন এবং তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খেতে দেন। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও, আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও ভরসা করে খাও।

(জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল আতইমা, হাদীস-১৮১৭)

একইভাবে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একটি গাধার ওপর আরোহণ করেন; এতে ফাদাক-এ বানানো চাদর ছিল। আর মহানবী (সা.) উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে নিজের পিছনে বসান। এ ধরনের কোনো চিন্তা ছিল না যে, আমার সাথে কে বসেছে, কে নয়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৫৬৬)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কুরবানীর দিন ফযল বিন আব্বাসকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, হাদীস-৬২২৮)

একইভাবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন পবিত্র মক্কা নগরে প্রবেশ করেন তখন লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য আসে। বিনয়ের আতিশয্যে তাঁর মাথা হাওদা স্পর্শ করছিল। তিনি (সা.) লোকদের মাঝে ছিলেন। বিজয় এবং মুসলমানদের আধিক্য দেখে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দাড়ি বিনয়ের কারণে হাওদা স্পর্শ করছিল বা প্রায় ছুঁয়ে ফেলার উপক্রম হচ্ছিল।তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৬)

ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা, বিনয় ও নম্রতার একটি দিক এটিও ছিল যে, তিনি (সা.) নিজের পেছনে নিজের মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসার (রা.) পুত্র উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে আরোহণ করিয়েছিলেন। অথচ কুরাইশের নেতৃবৃন্দের পুত্ররা ছিল, বনু হাশেমের পুত্ররা ছিল।

(শারাহ যারকানি,৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন, সেই উচ্চতা যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাদের দেওয়া হয় সেটি বিনয়ের আদলে হয়ে থাকে। অপরদিকে শয়তানের উচ্চতা অহংকার মিশ্রিত হয়। অর্থাৎ, তার মাঝে অহংকার থাকে। লক্ষ করো! মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবেই মাথা অবনত রাখেন ও সিজদা করেন যেভাবে তিনি সেসব বিপদ ও কষ্টের দিনগুলোতে মাথা নত করতেন ও সিজদা করতেন, যখন এই মক্কাতেই তাঁর সর্বপ্রকার বিরোধিতা করা হতো এবং দুঃখ দেওয়া হতো। যখন তিনি দেখলেন, আমি কোন অবস্থায় এখান থেকে বেরিয়েছিলাম ও এখন কোন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছি- তখন তাঁর হৃদয় খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় এবং তিনি (সা.) সিজদা করেন।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬০-এর টিকা)

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের দিন আমাদের প্রতি তিনজন ব্যক্তির জন্য একটি করে উট নির্ধারিত ছিল। হযরত আবু লুবাবা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। যখন মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসে তখন এই দুই ব্যক্তি বলেন, আমরা আপনার স্থলে পায়ে হাঁটব আর আপনি বাহনে থাকুন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা দুইজন পায়ে হাঁটার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর আমি তোমাদের দুইজনের তুলনায় প্রতিদান লাভের বিষয়ে অমুখাপেক্ষীও নই।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৬-১১৭, হাদীস-৪০০৯)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) নিজ সঙ্গীদের সাথে একটি সফরে ছিলেন। তিনি (সা.) একটি ছাগল দিয়ে খাবার প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। একজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! এটি জবাই করা আমার দায়িত্ব। অপরজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! এটির চামড়া ছাড়ানো আমার দায়িত্ব। একজন বললেন, এটি রান্না করা আমার দায়িত্ব। এতে মহানবী (সা.) বললেন, আর জ্বালানী সংগ্রহ করা আমার দায়িত্ব। সাহাবীরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমরাই যথেষ্ট। তিনি (সা.) বললেন, আমি জানি তোমরা যথেষ্ট, কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে বিশেষত্ব চাই না। বান্দা নিজ সঙ্গীদের ওপর কোনো বিশেষত্ব প্রকাশ করবে– তা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। এরপর তিনি (সা.) উঠলেন এবং জ্বালানী সংগ্রহ করতে লাগলেন।

(তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭-৩৮৮)

এমন কোনো পরিস্থিতি আসত না যেখানে তিনি (সা.) স্পষ্টভাবে নিজের বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ না করতেন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (সা.) নিজ গৃহে কী কী করতেন? তিনি (রা.) বলেন, তিনি (সা.) নিজেকে ঘরের লোকদের কাজে ব্যস্ত রাখতেন। অর্থাৎ, নিজ ঘরের লোকদের সাথে তাদের কাজে সহায়তা করতেন। যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি (সা.) নামাযের জন্য চলে যেতেন। (সহীহ বুখারী কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৭৬)

সুতরাং এটি সেসব পুরুষের জন্যও শিক্ষণীয় যারা ঘরের কাজকর্ম করতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে, আর স্ত্রীদেরও অভিযোগ থাকে ও অভিযোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

হিশাম বিন উরওয়া একইভাবে নিজ পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) কি ঘরে কোনো কাজ করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ; রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের জুতা মেরামত করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন এবং নিজ গৃহে সেভাবেই কাজ করতেন যেভাবে তোমাদের কেউ নিজ ঘরে কাজ করে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড-৮, পৃ: ৩১৩, হাদীস-২৫৮৫৫)

এর দ্বারা এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর আদর্শ দেখে সাহাবীরা নিজেদের ঘরের কাজে নিজেদের স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। কিন্তু এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত, ঘরের কাজের মূল দায়িত্ব স্ত্রীদের। আর এই কথাটি শুনে (স্ত্রীরা) যেন এমনটা ভেবে না বসে যে, তারা নিজেদের কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। তবে পুরুষদের দায়িত্ব হলো স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করা।

অনুরূপভাবে অন্য একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, কাসেম বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের গৃহে কী কাজ করতেন? তখন তিনি ব্যক্ত করেন, তিনি (সা.) মানুষদের মধ্য হতেই একজন মানুষ ছিলেন; নিজের কাপড় নিজে ঝাড়তেন, নিজের ছাগলের দুধ নিজে দোহাতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড-৮, পৃ: ৫০৭, হাদীস-২৬৭২৪)

হযরত আবু বুরদা একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন; এধরনের রেওয়ায়েত পূর্বেওবর্ণিত হয়েছে, এখাতে অতিরিক্ত একথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি (সা.) পশমি পোশাক পরিধান করতেন, গবাদিপশু বাঁধতেন এবং অতিথির দেখাশোনা নিজেই করতেন।

(দালাইলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৯)

অতিথি আপ্যায়নও নিজেই করতেন এবং সব ধরনের পোশাক– তা যতই মোটা ও খসখসেহোক– তিনি পরিধান করতেন; কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ ছিল না। তাঁর পোশাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে।

হযরত আমের বিন রবীয়া (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বললেন, আমি মহানবী(সা.)-এর সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে তাঁর (সা.) জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। তখন আমি তাঁর জুতাটি নিয়ে ঠিক করতে লাগলাম। তখন তিনি (সা.) আমার হাত থেকে সেই জুতাটি নিলেন এবং বললেন, এটা একটি বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক আচরণ, আর আমি বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক আচরণ পছন্দ করি না।

(মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফোয়ায়েদ, লিল বাইহাকি, খণ্ড-৮, পৃ: ৪২২)

হাসনা বিন খালিদ এবং সাওয়া বিন খালিদ (রা.) বর্ণনা করেন, তারা উভয়েই রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে এমন সময় উপস্থিত হন যখন তিনি (সা.) কোনো দেওয়াল অথবা নিজের কোনো ঘরের মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬) স্বহস্তে নিজের ঘরের কাজ করছিলেন।

একইভাবে সহীহ্ বুখারীতে মসজিদে নববী নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।যখন নবী (সা.)-এর উটটি সেখানে গিয়ে থেমে পড়ে যেখানে দুই অনাথ বালকের জমি ছিল, তখন তিনি (সা.) বলেন, এই স্থানটি আমাদের জন্য উপযুক্ত। অতঃপর সেই বালকদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাদের সেই জমির মূল্য পরিশোধ করেন। আর তারপর যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয় তখন তিনি (সা.) সাধারণ মানুষের সাথে যোগ দেন এবং ইট বহন করা আর মসজিদ নির্মাণের যে কাজ ছিল– তাতেও সশরীরে অংশ নেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৯০৬)

অনুরূপভাবে হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি, তিনি মাটি বহন করছিলেন। অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর বুকের পশমগুলোকে মাটি ঢেকে ফেলেছিল।

(সহীহ বুখঅরী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-৩০৩৪)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সকালে আব্দুল্লাহ্ বিন আবি তালহাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে যাই যেন তিনি তাকে মধু খাইয়ে দেন। আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে পশু দাগানোর লোহা ছিল। তিনি তাকে মধু খাওয়ালেন। অর্থাৎ শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, মধুর খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।তখন তিনি কাজ করছিলেন। তাঁর হাতে পশুতে দাগ দেবার সেই যন্ত্রটি ছিল যা দিয়ে জন্তুর গায়ে দাগ দেওয়া হয়, যেন তা চিহ্নিত হয়ে যায়; আর তিনি সদকার উটগুলোকে চিহ্নিত করছিলেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৫০২)

যেখানেই সুযোগ পেতেন, তা যদি নিজের করার মতো হতো তবে সহযোগিতার জন্য ডাকার পরিবর্তে নিজেই তা করে নিতেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু উমামা বাহলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদের মাঝে আসেন আর তিনি একটি লাঠির ওপর ভর দিয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। এটি দেখে তিনি (সা.) বলেন, পারস্যের অধিবাসীরা তাদের বড়োবড়ো ব্যক্তিদের সম্মানে যেভাবে দাঁড়িয়ে যায়– তোমরা তেমনটি কোরো না। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। তখন তিনি দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমাদের ইবাদত গ্রহণ করো, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও, আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো, আর আমাদের সমস্ত বিষয়াদি শুধরে দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি যেন আমাদের আরও বেশি দোয়া দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য সমস্ত কল্যাণকর কথা এক সুতোয় গেঁথে দিই নি?

অর্থাৎ, এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি দোয়া, তোমরা এটাই করতে থাকো।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুদ দোয়া, হাদীস নম্বর-৩৮৩৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর বিনয়ের মান এমন ছিল যে, তিনি (সা.) নিজের আগমনে লোকদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে বারণ করতেন। বলতেন, এটি তো ইরানীদের রীতি। আমি কোনো বাদশা নই বরং খোদা তা'লা আমাকে নবী বানিয়েছেন। ”

(তফসীরে কবীর, খণ্ড-১৫, পৃ: ১৫৭)

সর্বোপরি মহানবী (সা.)-এর বিনয় সেই মানের ছিল যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আর এটিই সেই আদর্শ যা অনুসরণে জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরাও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর আদর্শের আলোকে আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আমার দৃষ্টিতে পবিত্র হবার এটি উত্তম পন্ধতি এবং এর চেয়ে ভালো অন্য কোনো পন্ধতি পাওয়া সম্ভব নয়; আর তা হলো, মানুষ যেন কোনো প্রকারেই অহংকার না করে– জ্ঞানের কারণেও না, বংশমর্যাদারও না বা ধনসম্পদেরও না।খোদা তা'লা কাউকে চোখ দান করলে পরে সে দেখতে পাবে যে, প্রত্যেক আলো যা সেই সকল অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে– তা আকাশ থেকেই এসে থাকে এবং মানুষ সর্বদা ঐশী আলোর মুখাপেক্ষী। আকাশ থেকে যে সূর্যের আলো এসে থাকে তা না আসলেচোখও দেখতে পায় না। একইভাবে অভ্যন্তরীণ আলো যা প্রত্যেক প্রকার অন্ধকারকে দূরীভূত করে এর পরিবর্তে খোদাভীতি ও পবিত্রতার নূর সৃষ্টি করে– তা আকাশ থেকেই এসে থাকে। আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের খোদাভীতি, ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা সবকিছু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে একে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আর চাইলে অপসারিত করতে পারেন।

অতএব, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলো, মানুষের নিজ সত্তাকে অর্থহীন এবং তুচ্ছ জ্ঞান করা আর মহান অস্তিত্বের দরবারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় ও অক্ষমতার দোহাই দিয়ে খোদা তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করা। সেই তত্ত্বজ্ঞানের আলো যাচনা করা যা প্রবৃত্তির আবেগকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে তার ভেতর এক প্রকার আলো এবং পুণ্যকর্মের জন্য শক্তিসামর্থ্য ও উষ্ণতা তৈরি করে।

জুমআর খুতবা

বিনয় সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ মে , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২২ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

আজ আলোচনা হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সিরাতের বিনয় ও নম্রতার দিকটি নিয়ে। আজও সেই বিষয়েরই আলোচনা চলবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিনয়ের মানদণ্ড কী ছিল? তিনি দৈনন্দিন জীবনের অতি ছোট ছোট ও সাধারণ বিষয়ের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটাতেন। সুতরাং হযরত ইয়াহইয়া ইবন আবি কাছীর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"আমি একজন দাস যেমন আহার করে তেমনই আহার করি, এবং একজন দাস যেমন বসে তেমনই বসি। কারণ আমিও তো একজন বান্দা মাত্র।"

(আল-জামি' লি-শু'আবিল ঈমান, ইমাম বায়হাকী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১৬, হাদীস নং ৫৫৭২, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২০০৩)

অর্থাৎ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্কিত অহংকার, আত্মম্ভরিতা, জাঁকজমক প্রদর্শন এবং আত্মগরিমা তাঁর মধ্যে ছিল না।

আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি উটনী ছিল, যার নাম ছিল আল-'আদবা। সেটি এত দ্রুতগামী ছিল যে, কোনো উটই তাকে অতিক্রম করতে পারত না। একদিন এক বেদুইন তার একটি তরুণ উটে চড়ে এলো, এবং প্রতিযোগিতায় তার উট আল-'আদবা-কে অতিক্রম করে গেল। এতে মুসলমানরা খুবই কষ্ট পেলেন। তাঁদের মনে হলো, আল-'আদবা পিছিয়ে পড়েছে-এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কেউ কেউ মনে করলেন, যেহেতু এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উটনী ছিল, তাই বেদুইনের উচিত ছিল তার উটকে থামিয়ে দেওয়া। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া দেখে বললেন:

"এটি আল্লাহরই নিয়ম যে, তিনি দুনিয়াতে যাকে উচ্চে তুলে ধরেন, তাকেই আবার নিচেও নামিয়ে আনেন।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বিনয় অধ্যায়, হাদীস নং ৬৫০১)

এখানে রাগ করার মতো কোনো বিষয়ই ছিল না। এটাই আল্লাহ তাআলার কার্যপ্রণালী। যা উপরে ওঠে, তা নিচেও নামে। সাধারণ মানুষ এমন বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সত্তাই ছিল প্রধান, এবং তিনি শুধু আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

কী গভীর বিনয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, "এতে রাগ করার কী আছে?"এর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উমরা পালনের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, 'হে আমার ভাই! তোমার দোয়ায় আমাকে ভুলে যেয়ো না।'চ

হযরত উমর (রা.) বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এমন একটি কথা বলেছিলেন, যার পরিবর্তে যদি আমাকে সমগ্র পৃথিবীও দেওয়া হতো, তবুও আমি এত আনন্দিত হতাম না।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, দোয়া অধ্যায়, হাদীস নং ১৪৯৮)

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করাকে ফরযস্বরূপ অপরিহার্য করেছেন এবং দোয়া কবুল হওয়ার জন্যও তা অপরিহার্য করেছেন। অথচ তাঁর বিনয়ের চরম নিদর্শন এই যে, তিনি তাঁরই একজন অনুসারীকে বলছেন-আমার জন্যও দোয়া করো।

তিনি কোনো কাজকেই নিজের মর্যাদার নিচু মনে করতেন না। বরং অতি ছোট কাজও নিজে করে অন্যদের দেখাতেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের শিক্ষা দিতেন।

এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বালকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন: "একটু সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে সঠিক পদ্ধতি দেখাই। আমার মনে হচ্ছে, তুমি চামড়া ছাড়াতে খুব দক্ষ নও।"

এরপর তিনি নিজের হাত চামড়া ও গোশতের মাঝখানে প্রবেশ করালেন এবং তা ভেতরে ঠেলে দিলেন, এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। তারপর বললেন: "এভাবে করো। হে বালক! এভাবেই চামড়া ছাড়াতে হয়।"

তিনি নিজেই পুরো কাজটি সম্পন্ন করলেন এবং একই সঙ্গে বালকটিকে সঠিক পদ্ধতিও শিখিয়ে দিলেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাহ, হাদীস নং ১৮৫)

আরেকটি বর্ণনায় অনুরূপভাবে অন্যদের সেবা করার ক্ষেত্রে তাঁর বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত খাব্বাব (রা.)-এর কন্যা বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি ছাগল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে এলেন যাতে সেটির দুধ দোহন করা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাগলটিকে বেঁধে দুধ দোহন করলেন। এরপর তিনি বললেন:

"তোমার বড় পাত্রটি নিয়ে এসো।"

তিনি একটি পাত্র নিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি বললেন:

"না, এর চেয়ে বড় পাত্র নিয়ে এসো।"

তখন আমি আরও বড় একটি পাত্র নিয়ে এলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে দুধ দোহন করলেন, এমনকি পাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন:

"তোমরা নিজেরাও পান করো এবং তোমাদের প্রতিবেশীদেরও পান করাও।"

(মুসনাদ আবি দাউদ আত-তায়ালিসী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪০, হাদীস নং ১৭৬৮, দার হিজর, মিসর, ১৯৯৯)

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন যে, তাঁর দোয়ার বরকতে দুধ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, এই বরকত অন্যদের সঙ্গেও ভাগ করে নিতে। সেই সময় ছাগলটি স্বাভাবিকের দ্বিগুণ দুধ দিয়েছিল।

লোকদের সালাম দেওয়া এবং মজলিসে বসার ক্ষেত্রেও তাঁর বিনয় ও উত্তম চরিত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন:

"যখনই কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসতেন, তিনি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। অপর ব্যক্তি নিজের হাত না সরানো পর্যন্ত তিনি নিজের হাত সরাতেন না। আর অপর ব্যক্তি নিজের মুখ না ফেরানো পর্যন্ত তিনি নিজের পবিত্র মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। কখনো তাঁকে তাঁর কোনো সঙ্গীর সামনে হাঁটু এগিয়ে বসতে দেখা যায়নি।"

(জামি' আত-তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রাকায়িক, অধ্যায় ৪৬, হাদীস নং ২৪৯০)

আরেকটি বর্ণনা হযরত আবু মুসান্না আমলুকী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ লাঠির ভর দিয়ে চলতেন এবং তার ওপর ভর করতেন।"

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

এই লাঠি কোনো প্রভাব বিস্তার করা বা মহিমা প্রদর্শনের জন্য বহন করা হতো না; বরং এটি ছিল আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয় ও নম্রতার একটি নিদর্শন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিনয় তো সকলের চেয়েও অধিক ছিল।

তিনি মানুষকে বিনয় অবলম্বনের উপদেশও অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ভঙ্গিতে দিতেন।

হযরত ইবন হাজন বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উটের মালিক ও ছাগলের মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক গর্ব ও অহংকারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যাদের অনেক উট ছিল তারা বলছিল:

"আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর আমাদের সম্পদও অনেক বেশি।"

ছাগলের মালিকরা বলছিল, তারাই উত্তম। এভাবে যখন বিতর্ক চলছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে এসে বললেন:

"মূসা (আ.)-কে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, আর তিনি ভেড়া চরাতেন। দাউদ (আ.)-কে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, আর তিনিও ভেড়া চরাতেন। আর আমাকেও নবী করে পাঠানো হয়েছে, এবং আমিও আজইয়াদ নামক স্থানে আমার পরিবারের ভেড়া চরাতাম।"

(আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসাঈ, কিতাবুত তাফসীর, সূরা ত্বা-হা, হাদীস নং ১১২৬২, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৭১-১৭২, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০০১)

এভাবে তিনি যারা অহংকার করছিল তাদের উপদেশ দিলেন, আবার যাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা হচ্ছিল-অর্থাৎ ছাগল চরানো লোকদের, যাদের তুচ্ছ মনে করা হচ্ছিল-তাদেরও সান্ত্বনা দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আজইয়াদের কথা উল্লেখ করেছেন, তা মক্কায় সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি স্থান। এ স্থানকে জিয়াদ নামেও ডাকা হয়।

(মু'জামুল বুলদান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে সামান্যতম অহংকারও ছিল না। তিনি দরিদ্রদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে মিলিত হতেন এবং গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতেন।

এভাবে একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বেদুইনদের মধ্যে, অর্থাৎ যারা গ্রামে বসবাস করতেন, জাহির (রা.) নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য উপহার নিয়ে আসতেন। তিনি গ্রাম থেকে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসতেন। আবার যখন ফিরে যাওয়ার সময় হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেও প্রচুর জিনিসপত্র ও রসদ দিয়ে বিদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, "জাহির আমাদের বেদুইন বন্ধু, অর্থাৎ গ্রামের বন্ধু, আর আমরা তার শহরের বন্ধু।"

একদিন এমন হলো যে, জাহির (রা.) বাজারে তাঁর কিছু পণ্য বিক্রি করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে এসে পেছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং নিজের মুবারক বক্ষের সঙ্গে চেপে ধরলেন। হযরত জাহির (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, "কে? আমাকে ছেড়ে দিন।" কিন্তু যখন তিনি ঘুরে দেখলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে চিনতে পারলেন, তখন তিনি নিজেই তাঁর পিঠ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুবারক বক্ষের সঙ্গে আরও জোরে ঠেকিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে লাগলেন, "এই দাসটিকে কে কিনবে?"হযরত জাহির (রা.) নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো আপনি আমাকে লোকসানের জিনিস হিসেবেই পাবেন। আমাকে কে কিনবে?"তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহর দৃষ্টিতে তুমি লোকসানের জিনিস নও।" অথবা তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর নিকট তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।"

(সহীহ ইবন হিব্বান, কিতাবুল হাজর ওয়াল ইবাহাহ, বাবুল মিযাহ ওয়াদ দাহক, হাদীস নং ৫৭৯০, পৃষ্ঠা ১৫৪৩, দারুল মারিফাহ, ২০০৪)

একই ঘটনাটি এক খুতবায় উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি জন্মগত একটি ত্রুটির কারণে দেখতে অত্যন্ত কুশ্রী ছিলেন,"অর্থাৎ তাঁর বাহ্যিক অবয়ব খুব সুন্দর ছিল না, "এবং তিনি অত্যন্ত দরিদ্রও ছিলেন। তাঁর শরীর ও কাপড় ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন ছিল। এই অবস্থায়, ঘামে ভিজে তিনি বাজারে কারও পণ্য বিক্রি করছিলেন। কিন্তু এই সাহাবীর মধ্যে এমন একটি গুণ ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হৃদয়ে বিশেষ মূল্য পেয়েছিল। তিনি তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমন অবস্থায়, যখন তিনি নিজেই নিজের প্রতি ঘৃণা অনুভব করছিলেন,"তিনি ভাবছিলেন যে আমি ঘামে ভিজে গেছি, সারা শরীরে ধুলাবালি লেগে আছে, এবং সম্ভবত তিনি লজ্জাও অনুভব করছিলেন, "তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পেছন থেকে এসে, যেমন শিশুদের সঙ্গে স্নেহভরে খেলা করা হয়, তেমনভাবে তাঁর দুই চোখ নিজের হাত দিয়ে ঢেকে দিলেন। তিনি হাত স্পর্শ করে বুঝতে পারলেন যে, এগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীরে প্রায় কোনো লোমই ছিল না, অথবা খুবই অল্প ছিল, এবং তাঁর শরীর ছিল অত্যন্ত কোমল। তখন তিনিও স্নেহভরে নিজের শরীর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীরের সঙ্গে ঘষতে লাগলেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাপড় ও শরীরেও ময়লা লেগে গেল, কিন্তু তিনি এতে সামান্যও বিরক্ত হলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ধরে বললেন, 'এ আমার দাস। একে কিনবে এমন কেউ আছে কি?' তখন সেই সাহাবীর হৃদয় আবেগে ভরে উঠল।" অর্থাৎ সেই সাহাবী "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'হে আমার প্রভু! এটি তো এক মূল্যহীন ও তুচ্ছ বস্তু। একে কে কিনবে?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'কখনোই না। আল্লাহর দৃষ্টিতে এর মূল্য অনেক বেশি।' (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬৩)

হযরত হাসান ইবন আলী (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহান চরিত্র, মানুষের সঙ্গে তাঁর বিনয়, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর উত্তম আচরণ এবং তাঁর মর্যাদার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন: আমি আমার মামা হিন্দ ইবন আবি হালাহকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র অবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে করতেন, আর আমি চেয়েছিলাম তিনি আমার সামনে এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। তখন তিনি আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল চতুর্দশীর পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং সব বিবরণ তুলে ধরলেন।

হযরত হাসান (রা.) বলেন, আমি এই বর্ণনা এবং তিনি আমাকে যে সব তথ্য দিয়েছিলেন, তা দীর্ঘদিন হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাছে গোপন রেখেছিলাম। পরে যখন আমি তাঁকে তা বর্ণনা করলাম, তখন জানতে পারলাম যে, তিনি ইতোমধ্যেই আমার আগে এ বিষয়ে জেনে নিয়েছিলেন এবং আমার মতো তিনিও একই বিষয়গুলো তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আরও জানা গেল যে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আলী (রা.)-এর কাছ থেকেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে প্রবেশ, গৃহ থেকে বের হওয়া এবং তাঁর অবয়ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং কোনো বিষয়ই বাদ দেননি।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে প্রবেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আগের বিষয়গুলো ছিল বাইরের জীবন সম্পর্কে। আর গৃহজীবনের বিষয়গুলো, যা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নিজের গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি গৃহের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। এক ভাগ আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারণ করতেন, এক ভাগ নিজের পরিবারের জন্য এবং এক ভাগ নিজের জন্য। এরপর নিজের জন্য নির্ধারিত অংশটিকেও তিনি নিজের ও মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। বিশেষ সাহাবীদের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে দ্বীনের বিষয়সমূহ পৌঁছে দিতেন এবং তাঁদের কাছ থেকে কোনো বিষয় গোপন রাখতেন না।

উম্মতের জন্য তাঁর সময় বণ্টনের পদ্ধতি ছিল এই যে, সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি উম্মতের সৎ ও উত্তম ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাঁদের দ্বীনি মর্যাদা অনুযায়ী সময় বণ্টন করতেন। কারও একটি প্রয়োজন ছিল, কারও দুটি, আবার কারও অনেক প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে এমন কাজে তাঁদের নিয়োজিত করতেন, যা তাঁদের নিজেদের এবং সমগ্র উম্মতের সংশোধন ও কল্যাণের কারণ হতো। তিনি তাঁদের উপকারী বিষয়সমূহ জানিয়ে দিতেন এবং বলতেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন এই বিষয়গুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন নিজে জানাতে পারে না, তার প্রয়োজন আমার কাছে পৌঁছে দাও। কেননা, যে ব্যক্তি এমন কারও প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছে দেয়, যে নিজে তা পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন।"

অতএব, এর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যে, তারা যেন অবশ্যই অভাবগ্রস্ত মানুষের বিষয়গুলো কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেন।

এ ধরনের বিষয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উত্থাপন করা হতো। এগুলো ছাড়া তিনি অন্য কারও কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা গ্রহণ করতেন না। মানুষ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জ্ঞান ও কল্যাণের অনুসন্ধানকারী হিসেবে আসত এবং কিছু না কিছু অর্জন না করে ফিরে যেত না; বরং তারা কল্যাণের পথপ্রদর্শক হয়ে ফিরে যেত।

তিনি, অর্থাৎ হযরত ইমাম হুসাইন (রা.), বলেন: এরপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন

গৃহের বাইরে থাকতেন, তখন তিনি কী করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রয়োজনীয় ও অর্থবহ কথা ছাড়া কিছু বলতেন না। তিনি সাহাবীদের হৃদয় জয় করতেন এবং তাঁদের মধ্যে বিরূপতা সৃষ্টি করতেন না। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দিতেন এবং তাঁদের ওপর তাকেই নেতা নিযুক্ত করতেন। তিনি মানুষকে সতর্ক করতেন এবং তাঁদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু এতে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও মনোরম স্বভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা যেত না। অর্থাৎ, কারও সম্পর্কে যদি কোনো সন্দেহ থাকত, তবে তিনি তাঁকে সতর্কও করতেন, কিন্তু এমনভাবে যে তাঁর আচরণে কোনো পরিবর্তন প্রকাশ পেত না; বরং তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে উত্তম আচরণই করতেন। হ্যাঁ, যেখানে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত, তাদের সম্পর্কেও সজাগ থাকতেন। কিছু লোক সন্দেহজনকও ছিল। তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্যদের কাছ থেকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। তিনি ভালো বিষয়ের প্রশংসা করতেন এবং তাকে আরও শক্তিশালী করতেন, আর মন্দ বিষয়কে মন্দ বলেই প্রকাশ করতেন এবং তার প্রভাব ভেঙে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনো উদাসীন হতেন না, যাতে মানুষও উদাসীন হয়ে পড়ে বা ক্লান্ত হয়ে যায়। তিনি সর্বদা প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি সত্য থেকে কখনো পিছিয়ে থাকতেন না, আবার সত্যের আগে অগ্রসরও হতেন না। সত্য যা দাবি করত, তিনি ঠিক সেই অনুযায়ীই কাজ করতেন। মানুষের মধ্যে তাঁর নিকটতম ছিল তারাই, যারা সর্বোত্তম ছিল।

তাঁর দৃষ্টিতে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি, যিনি সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আর তাঁর নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তিনি, যিনি মানুষের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল এবং সাহায্যকারী ছিলেন।

সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেই ব্যক্তি, যিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাদের সাহায্য করেন। যিনি মর্যাদায় উচ্চ ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটবর্তী হতেন এবং তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন: এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি উঠতে ও বসতে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতেন। যখন তিনি কোনো সমাবেশে যেতেন, তখন যেখানে মজলিস শেষ হতো সেখানেই বসতেন এবং অন্যদেরও এ নির্দেশ দিতেন। তিনি প্রত্যেক সাহাবীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিতেন। কারও মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতো না যে, অন্য কেউ তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানিত। যে-ই তাঁর কাছে বসত এবং কোনো প্রয়োজনের কথা পেশ করত, তিনি তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতেন এবং তার সঙ্গে থাকতেন, যতক্ষণ না সে নিজেই উঠে চলে যেত। আর যে ব্যক্তি তাঁর কাছে কোনো প্রয়োজন নিয়ে আসত, তাকে তিনি প্রয়োজন পূরণ না করে বা অন্তত কোমলভাবে কথা না বলে ফিরিয়ে দিতেন না। কেউ যদি কোনো প্রয়োজন নিয়ে আসত, তিনি কিছু দান করতেন, আর যদি কিছু দিতে না পারতেন, তবে অত্যন্ত কোমল ভাষায় উত্তর দিতেন। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, তাঁর উদারতা এবং তাঁর এই উত্তম চরিত্র ছিল সবার জন্য। তিনি যেন সবার পিতা হয়ে গিয়েছিলেন। অধিকারের দিক থেকে তাঁর দৃষ্টিতে সবাই সমান ছিল।

তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততার মজলিস। সেখানে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলা হতো না। সম্মানিত বিষয়গুলোর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হতো না। কারও দুর্বলতা বা ত্রুটি আলোচনা করা হতো না। সবাই নিজেদের মধ্যে সমান ছিল এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করত।

এখন মানুষ একে অপরের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করে। না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিসে এমনটি কখনো ঘটেনি। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করতেন। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করতেন, কনিষ্ঠদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন, অভাবগ্রস্তকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং আগন্তুকের যত্ন নিতেন। এমন নয় যে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তি এলে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হতো না; তাঁরও যথাযথ যত্ন নেওয়া হতো।

(শামায়িলুন নবী ?, বাব মা জা'আ ফি তাওয়াদু'ই রাসূলিল্লাহ, বর্ণনা নং ৩২১, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪০, নূর ফাউন্ডেশন প্রকাশিত)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিমগ্ন থাকে, তারা কোনো পদমর্যাদা বা নেতৃত্ব কামনা করে না। তারা নির্জনতা এবং একাকী ইবাদতের আনন্দকে এসব পদমর্যাদার ওপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের নির্জনতা থেকে বের করে আনেন এবং সৃষ্টির কল্যাণের জন্য তাঁদের প্রেরণ করেন। আমাদের মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং চাইতেন না যে, কেউ তাঁর সম্পর্কে জানুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে সেখান থেকে বের করে আনলেন এবং সমগ্র বিশ্বের হেদায়াতের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করলেন।

হাজার হাজার কবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করত। কিন্তু অভিশপ্ত সেই হৃদয়, যে মনে করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের প্রশংসায় আত্মগর্বে ভরে উঠতেন,"অর্থাৎ তিনি তাতে আত্মতৃপ্ত হতেন।

"তিনি এসবকে মৃত কীটপতঙ্গের মতোই মনে করতেন। প্রকৃত প্রশংসা তো সেটিই, যা আকাশ থেকে আল্লাহ করেন। এ ধরনের মানুষ ব্যক্তিগত ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকে। পৃথিবীর প্রশংসা ও স্তুতির প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ থাকে না। সুতরাং এটি এমন এক মর্যাদা, যেখানে আল্লাহ নিজেই আসমান ও আরশ থেকে তাদের প্রশংসা ও স্তুতি করেন।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৩৯, ২০২২ সংস্করণ)

এরপর হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন:

"একজন খ্রিষ্টান আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অত্যন্ত আপ্যায়ন ও যত্ন নিলেন। সে খুব ক্ষুধার্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এমনভাবে আহার করালেন যে, তার পেট ভরে গেল। রাতে তিনি নিজের চাদর তাকে ব্যবহার করতে দিলেন। ঘুমের মধ্যে তার প্রচণ্ড ডায়রিয়া হয়, যা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, ফলে চাদরটি নোংরা হয়ে যায়। সকালে সে ভাবল, এই অবস্থা দেখে সবাই ঘৃণা করবে। তাই লজ্জায় কাউকে কিছু না বলে চলে গেল। পরে লোকেরা তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিবেদন করল যে, সেই খ্রিষ্টান চাদরটি নষ্ট করে গেছে; এতে মল লেগে আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আমাকে দাও, আমি এটি ধুয়ে দেব।' লোকেরা নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন কষ্ট করবেন? আমরা যারা আছি, আমরাই ধুয়ে দেব।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সে ছিল আমার অতিথি, তাই এটি আমার দায়িত্ব।' এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, পানি আনতে বললেন এবং নিজেই তা ধুতে শুরু করলেন।"

চরম বিনয়ের সঙ্গে তিনি অতিথির ময়লা পরিষ্কার করলেন।

"ওই খ্রিষ্টান যখন প্রায় এক কোস দূরে চলে গিয়েছিল, তখন তার মনে পড়ল যে, তার সোনার ক্রুশটি বিছানায় ফেলে এসেছে। তাই সে ফিরে এলো এবং দেখল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে তাঁর চাদর থেকে তার মল পরিষ্কার করছেন। এতে সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এবং বলল, যদি বিষয়টি আমার হতো, তবে আমি কখনোই এটি ধুতাম না। তখন সে বুঝতে পারল,"অর্থাৎ তার মনে হলো, "এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এত আত্মত্যাগ,"এত বিনয়, "তিনি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬, ২০২২ সংস্করণ)

এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর প্রথম ওহি নাযিল হওয়ার সময়ও তাঁর বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ সুস্পষ্ট ছিল।

হেরা গুহার ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "প্রথম ওহি হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন জিবরাইল (আ.) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এসে বললেন, 'ইকরা', অর্থাৎ 'পড়ো'। এর উত্তরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'মা আনা বি-কারি', অর্থাৎ 'আমি পড়তে জানি না।' এর অর্থ ছিল, এই দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করবেন না। কারণ তখন তাঁর সামনে এমন কোনো বই রাখা হয়নি, যা তাঁকে পড়তে হতো; বরং জিবরাইল (আ.) যা বলতেন, তা তাঁকে মুখে উচ্চারণ করতে হতো। তিনি তা বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি বিনয় প্রকাশ করেছিলেন। তবে যেহেতু আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাঁকেই এই দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন, তাই তিনি বারবার বললেন, 'পড়ো।' অবশেষে তৃতীয়বার তিনি পড়লেন,"এরপর ফেরেশতা তাঁকে 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক...' আয়াতগুলো পাঠ করালেন।

(ফাযায়িলে কুরআন নং ২, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১০৯)

এভাবেই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি তাঁর তাফসীরে, তাফসীরে কাবীর-এর সূরা আল-কাউসারের ব্যাখ্যায় আরেক স্থানে সম্ভবত এভাবে লিখেছেন:

"যখন তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি অসাধারণ বিনয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরা দেখি, অন্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ইলহাম লাভ করে বা কোনো স্বপ্ন দেখে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কাছে ছুটে যায় এবং বলে যে, আমার কাছে অমুক ইলহাম এসেছে বা আমি অমুক স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু যখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এসে বললেন, 'ইকরা'-'পড়ো', তখন

তিনি বললেন, 'মা আনা বি-কারি'-'আমি পড়তে জানি না।' তিনি এ কথা তিনবার বলেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দৃঢ় নির্দেশ রয়েছে, তখন তিনি সেই আদেশ মেনে নিলেন এবং এমন সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মতো তিনি বলেননি, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য অন্য কোনো সহকারী নির্ধারণ করুন।' বরং তিনি একাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং সাহায্যের জন্য কোনো সঙ্গীও প্রার্থনা করলেন না।"

(তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯, ২০২৩ সংস্করণ)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরও বলেন:

"তাঁর বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, একদিন একজন আনসারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁকে দেখতে গেলেন। ফেরার পথে সেই আনসারী তাঁকে আরোহনের জন্য একটি ঘোড়া দিলেন এবং নিজের পুত্রকে বললেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে যাও। হয়তো পথে তিনি আর কাউকে পাবেন না।' অর্থাৎ, সফরে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো সঙ্গী নাও থাকতে পারে। 'পরে সুযোগমতো ঘোড়াটি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' কিছুক্ষণ পর তাঁর ছেলে ফিরে এল। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তো তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম, যাতে পথে নিরাপত্তা থাকে এবং ঘোড়াটি ভয় না পায়। অথচ তুমি ফিরে এলে কেন?' ছেলে উত্তর দিল, 'আমি বাধ্য হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইরে এসে আমাকে বললেন, "তুমিও আমার পেছনে উঠে বসো।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি এমন বেয়াদবি করতে পারি না।" তখন তিনি বললেন, "তাহলে আমিও এটা সহ্য করতে পারি না যে, তুমি পায়ে হেঁটে চলবে আর আমি ঘোড়ায় চড়ে থাকব। হয় তুমি আমার সঙ্গে ঘোড়ায় উঠবে, নতুবা ফিরে যাও।"' তাই,"তারা বলেন, অর্থাৎ সেই ছেলে বলল, "আমি ফিরে এলাম,"এটাকেই উত্তম মনে করে। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

(তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৫৭, ২০২৩ সংস্করণ)

একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি খেজুরপাতার চাটাইয়ের ওপর শয়ন করেছিলেন। যখন তিনি উঠলেন, তখন তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্য একটি বিছানার ব্যবস্থা করি? আমরা আপনার জন্য একটি নরম বিছানা তৈরি করে দিই।" তখন তিনি বললেন:

"এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমার উদাহরণ তো সেই আরোহীর মতো, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার চলে যায় এবং সেই স্থানকে পেছনে ফেলে আসে।"

(জামি' আত-তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩৭৭)

সহীহ বুখারীতে হযরত উমর (রা.)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন: একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তাঁর উপরের কক্ষে ছিলেন। তখন তিনি একটি মোটা চটের ওপর শয়ন করছিলেন। তাঁর এবং সেই চটের মধ্যে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুর গাছের আঁশে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। তাঁর পায়ের কাছে ছিল বাবলা গাছের শুকনো পাতার একটি স্তূপ এবং মাথার কাছে কয়েকটি কাঁচা চামড়া ঝুলছিল। আমি তাঁর পার্শ্বদেশে সেই চটের দাগও দেখতে পেলাম। যে চাটাইটি বিছানো ছিল, তারই দাগ সেখানে পড়েছিল। এটি দেখে আমি অশ্রুসজল হয়ে পড়লাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী তোমাকে কাঁদাচ্ছে?"আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! কিসরা ও কায়সার বিলাসিতার মধ্যে রয়েছে, আর আপনি আল্লাহর রাসূল!"তখন তিনি বললেন:

"তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাব তাবতাগী মারদাতা আযওয়াজিক, হাদীস নং ৪৯১৩, অনুবাদ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২৬৪ ও ২৬৭, নাযারতে ইশাআত প্রকাশিত)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়াবি আরাম-আয়েশের অবস্থা এমন ছিল যে, একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি অনুমতি চাওয়ার জন্য একটি ছেলেকে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেজুরপাতার তৈরি একটি চাটাইয়ের ওপর শয়ন করছিলেন। হযরত উমর (রা.) ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি উঠে বসলেন। হযরত উমর দেখলেন, ঘরটি সম্পূর্ণ খালি এবং সেখানে সাজসজ্জার কোনো জিনিস নেই। একটি খুঁটির সঙ্গে একটি তরবারি ঝুলছিল, অথবা সেই চাটাইটি ছিল, যার ওপর তিনি শয়ন করছিলেন এবং যার দাগ তাঁর পবিত্র পিঠে স্পষ্ট হয়ে ছিল। এটি দেখে হযরত উমর কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে উমর! কী তোমাকে কাঁদিয়েছে?' হযরত উমর নিবেদন করলেন, কিসরা ও কায়সার বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করছে, আর আপনি, যিনি আল্লাহর রাসূল এবং ইহলোক ও পরলোকের সম্রাট, আপনি এমন অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

'হে উমর! পৃথিবীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো সেই পথিকের মতো, যে নিজের গন্তব্যের দিকে উটে চড়ে যাত্রা করছে। পথটি মরুভূমির মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড গরমে সে একটি গাছ দেখতে পায়, তার ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, আর যখন তার শরীরের ঘাম কিছুটা শুকিয়ে যায়, তখন আবার যাত্রা শুরু করে।"(মালফুযাত, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯, ২০২২ সংস্করণ)

এমনকি অসভ্য ও রূঢ়? স্বভাবের মানুষের সঙ্গেও তিনি সর্বদা নম্রতা ও বিনয়ের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রদর্শন করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে কঠোর ভাষায় তাঁর পাওনা দাবি করল। সম্মানিত সাহাবীগণ এতে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও। কারণ যার অধিকার আছে, তার কথা বলারও অধিকার আছে। যেহেতু আমাকে তার অধিকার আদায় করতেই হবে, তাই তার কথা বলারও অধিকার রয়েছে। তোমরা একটি উট কিনে তাকে দিয়ে দাও।" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পাওনা নিতে এসেছিল, তার জন্য একটি উট কিনে দাও। সাহাবীগণ বললেন, "আমরা তার প্রাপ্য উটের সমমানের কোনো উট পাইনি। তবে তার চেয়ে ভালো উট পাওয়া যাচ্ছে।" তখন তিনি বললেন, "সেই ভালো উটটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল বুয়ূ', বাবুল ইফলাস ওয়াল ইনযার, প্রথম অংশ, হাদীস নং ২৯০৬, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩৭, মাকতাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

এখন এ বিষয়েই নানা ধরনের বিরোধ দেখা দেয়। মানুষ যে প্রকৃত ঋণ পরিশোধ করা উচিত, সেটিও পরিশোধ করে না; বরং তা কমিয়ে দেওয়ার জন্য ঝগড়া-বিবাদ ও তর্কে লিপ্ত হয়। আমরা যদি এসব বিষয় বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের অনেক বিরোধেরই অবসান হয়ে যাবে।

একইভাবে তাঁর বিনয়ের আরেকটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় যখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখে বললেন, "হে আবু বকর! আপনি এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ঘরেই রেখে আসতেন। আমিই তাঁর কাছে চলে যেতাম।" তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে উপস্থিত হওয়াই তাঁর জন্য অধিক উপযুক্ত, আপনার তাঁর কাছে যাওয়া নয়।" এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে বসালেন। তখন মহানবী তাঁর বক্ষে হাত রেখে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি শান্তি লাভ করবেন।" অতঃপর আবু কুহাফা ইসলাম গ্রহণ করেন।

(আল-ইসাবাহ ফি তামইয়ীযিস সাহাবাহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৭৫, মাকতাবাহ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫)

একইভাবে, গৃহে অত্যন্ত সরল জীবনযাপনের প্রসঙ্গে হযরত হাসান (রা.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁর জন্য কোনো প্রহরী বা দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে থাকত না। সকাল-সন্ধ্যায় বড় বড় পাত্রে তাঁর জন্য বিলাসবহুল খাবারও পরিবেশন করা হতো না। অর্থাৎ, তাঁর জন্য কোনো উন্নতমানের বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা হতো না। যে-ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইত, সহজেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত। তিনি মাটিতে বসতেন, মাটিতেই নিজের খাবার রাখতেন, সাধারণ ও মোটা কাপড় পরিধান করতেন, গাধার ওপর আরোহন করতেন, নিজের বাহনে অন্যদেরও পেছনে বসাতেন এবং আহার শেষে নিজের আঙুল চেটে পরিষ্কার করতেন।(আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৭১, হাদীস নং ২০৮৩৮, মাকতাবাতুর রুশদ)

আঙুল চাটার প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে একটি হাদীস রয়েছে, যেখানে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহার শেষে হাত পরিষ্কার করার আগে, অর্থাৎ ধোয়ার আগে, মানুষ যেন নিজের আঙুল চেটে নেয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আতইমাহ, বাব লা'কুল আসাবি' ওয়া মাসহিহা..., হাদীস নং ৫৪৫৬)

বুখারীর ব্যাখ্যায় আঙুল চাটার প্রসঙ্গে হযরত জয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ শাহ সাহেব (রা.) তাঁর একটি টীকায় লিখেছেন:

"হযরত সৈয়দ (ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব, রা.) বলেন: 'এ বিষয়টি সকল জ্ঞানী ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় এসেছে এবং সকল চিকিৎসকই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের হাতের আঙুলে স্পর্শশক্তির একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা কোনো কাপড়ের কোমলতা পরীক্ষা করতে চাই, তবে হাতের আঙুল ছাড়া তার প্রকৃত কোমলতা নির্ণয় করতে পারি না। যদিও স্পর্শশক্তি সমগ্র দেহেই বিদ্যমান, কিন্তু হাত ছাড়া, যেমন পা দিয়ে যদি আমরা কোমলতা নির্ণয় করতে চাই, তবে আমরা পূর্ণ সফল হতে পারব না। হ্যাঁ, একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রভাব রয়েছে, যা কেবল হাতে, বরং বিশেষভাবে আঙুলে সীমাবদ্ধ। আর আঙুলের সঙ্গে চোখের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যা মনোযোগের একটি মাধ্যম। এ কারণেই যারা দৃষ্টি-প্রভাব বা মনঃসংযোগের প্রয়োগ (অপারেটর) করেন, তারা সাধারণত যার ওপর এই প্রভাব প্রয়োগ করেন, তার আঙুলের দিকেই বেশি তাকিয়ে থাকেন। এভাবে তারা আঙুলের মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টির প্রভাব (মেসমেরিজম) আরও কার্যকরভাবে সেই ব্যক্তির ওপর বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হন। একইভাবে, হাতে প্রস্তুতকৃত ওষুধও অধিক উপকারী।'

বর্তমান যুগে অবশ্য প্রায় সবকিছুই যন্ত্রের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু সে সময় চিকিৎসক ও হাকিমরাও একই কথা বলতেন। ডা. ইসমাইল সাহেব নিজেও একজন উচ্চশিক্ষিত সার্জন ও চিকিৎসক ছিলেন। যাই হোক, তিনি বলেছেন যে, "হাতে প্রস্তুতকৃত ওষুধ যন্ত্রে প্রস্তুত ওষুধের তুলনায় অধিক উপকারী। ... সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে, যখন একজন মানুষ আহারের সময় নিজের আঙুল দিয়ে লোকমা তুলে খায়, তখন প্রতিবার লোকমা তোলার সময় তার দৃষ্টি আঙুলের অগ্রভাগে পড়ে। তাই আহার শেষে যখন সে পানি দিয়ে ধোয়ার বা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলার আগে নিজের আঙুল চেটে পরিষ্কার করে, তখন খুবই স্পষ্ট যে, আঙুলে লেগে থাকা খাদ্যের তেল-চর্বির সঙ্গে সেই বিশেষ প্রভাবও পাকস্থলীতে পৌঁছে যায় এবং পাকস্থলীর কার্যক্ষমতা, অর্থাৎ হজমশক্তিকে শক্তিশালী করে। ফলে খাদ্য দ্রুত হজম হয়।"

এটি সে সময়ের চিকিৎসক ও হাকিমদের অভিমত ছিল। বর্তমান সময়ে কী মত রয়েছে, তা জানা নেই; আজকের চিকিৎসকেরা হয়তো এর সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। তবে যাই হোক, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আহারের পর হাতে যা লেগে থাকে, তা চেটে নেওয়ার মধ্যে উপকার রয়েছে।

বুখারীর বর্ণনায় এসেছে:

"ফালা ইয়ামসাহ ইয়াদাহু হাত্তা ইয়ালআকাহা আও ইউলইকাহা-"সে যেন নিজের হাত মুছে না ফেলে, যতক্ষণ না সে নিজে তা চেটে নেয় অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাটায়।"

ব্যাখ্যাকারগণ "অন্য কাউকে দিয়ে চাটানোর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এর অর্থ হলো, সে চাইলে তার খাদেম, তার সন্তান, অথবা এমন কাউকে দিয়ে আঙুল চাটাতে পারে, যে এতে ঘৃণা অনুভব করে না।

এখন, যার নিজেরই খাবার খাওয়ার কথা, তার আর কী প্রয়োজন-সে তো নিজেই নিজের আঙুল চেটে নিতে পারে। তাই কখনো কখনো ব্যাখ্যাকারগণ অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা প্রসারিত করে ফেলেন। যাই হোক, "এটি অনুপযুক্ত এবং মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে হয়"যে, অন্য কাউকে বলা হবে আমার আঙুল চেটে দিতে। "এর একটি অর্থ অবশ্য হতে পারে,"অর্থাৎ এটি সম্ভব যে, "খাওয়ার পর মানুষ নিজেই নিজের আঙুল চেটে পরিষ্কার করবে এবং যাঁরা তার তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় রয়েছে, তাঁদেরও নির্দেশ দেবে যেন তারাও নিজেদের আঙুল এভাবেই পরিষ্কার করে, যাতে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই নির্দেশনার মধ্যে নিহিত স্বাস্থ্যগত উপকারিতা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যের অংশীদার হতে পারে।"

(সহীহ আল-বুখারী, অনুবাদ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৪০০, কিতাবুল আতইমাহ, বাব লা'কুল আসাবি' ওয়া মাসহিহা, ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লিমিটেড)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই মসজিদ পরিষ্কার করা বা ঝাড়ু দেওয়ার কাজকে নিজের মর্যাদার নিচু মনে করতেন না।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইয়াকুব ইবন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লাঠির সাহায্যে মসজিদে জমে থাকা ধুলোবালি ও ময়লা পরিষ্কার করতেন।

এর অর্থ সম্ভবত এই যে, তিনি লাঠির আগায় কাপড় বা অনুরূপ কিছু বেঁধে তা দিয়ে ঝাড়ু দিতেন।

(আল-মুসান্নাফ লি ইবন আবি শাইবাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১, হাদীস নং ৪০৪৪, আল-ফারুক আল-হাদীসিয়্যাহ লিত-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, ২০০৮)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বসে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একজন ফেরেশতা অবতরণ করছেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, "এ সেই ফেরেশতা, যিনি সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি।" যখন সেই ফেরেশতা নেমে এলেন, তখন তিনি বললেন, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি কি আপনাকে একজন রাজা-নবী করবেন, না একজন বান্দা-রাসূল করবেন?" তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার প্রতিপালকের জন্য বিনয় অবলম্বন করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "বরং আমাকে একজন বান্দা-রাসূল হিসেবেই প্রেরণ করুন।"

(মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩, মুসনাদ আবি হুরাইরাহ, হাদীস নং ৭১৬০, আলামুল কুতুব, ১৯৯৮)

এটাই ছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাব। জিবরাঈল (আ.) যদি এ কথাটি না-ও বলতেন, তবুও তিনি একই উত্তর দিতেন। তিনি সর্বদাই এ শিক্ষাই দিয়েছেন এবং তাঁর অনুসারীদের বলেছেন, "আমি তো কেবল একজন মানব-রাসূল।" যাই হোক, এই বর্ণনার অর্থ হলো, যদি এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, তবে বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলতেন যে, আমি রাজা-রাসূল হতে চাই না। আমি আল্লাহর বিনীত বান্দা ও তাঁর রাসূল হতে চাই। আর এ কথাই আমাদের কালিমায়ও উল্লেখ রয়েছে।

একজন সত্যিকারের মুসলমানের বিনয় কেমন হওয়া উচিত? এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইয়াদ ইবন হিমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহি করেছেন যে, তোমরা এমনভাবে বিনয় অবলম্বন করো, যাতে কেউ কারও ওপর অত্যাচার না করে এবং কেউ কারও ওপর গর্ব না করে।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফিত-তাওয়াদু', হাদীস নং ৪৮৯৫)

তাঁর সত্যনিষ্ঠ খাদেম, হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.), আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

"মানুষের উচিত বিনয় অবলম্বন করা। বিনয় শেখা কঠিন কোনো বিষয় নয়। শেখারই বা কী আছে? মানুষ তো নিজেই বিনম্র এবং তাকে বিনয়ের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। 'মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদূন'... অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। অহংকার ও এ ধরনের বিষয়গুলো সবই কৃত্রিম। যদি মানুষ এই কৃত্রিমতা দূর করে দেয়, তবে তার স্বভাবে কেবল বিনয়ই প্রকাশ পাবে।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৮, ২০২২ সংস্করণ)

আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিনয়ের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু ও পরম করুণাময়। তিনি মানুষকে সব দিক থেকে লালন-পালন করেন এবং তার প্রতি দয়া করেন। আর এই দয়ার কারণেই তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের ও রাসূলদের প্রেরণ করেন, যাতে তারা পৃথিবীর মানুষকে পাপময় জীবন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু অহংকার একটি অত্যন্ত ভয়ংকর রোগ। যার মধ্যে এটি সৃষ্টি হয়, তার জন্য এটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই রোগ হত্যা থেকেও ভয়াবহ। একজন অহংকারী ব্যক্তি শয়তানের ভাই হয়ে যায়। কারণ অহংকারই শয়তানকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল। সুতরাং একজন মুমিনের জন্য শর্ত হলো, তার মধ্যে যেন কোনো অহংকার না থাকে; বরং তার মধ্যে বিনয়, নম্রতা ও দীনতা বিদ্যমান থাকে। আর এটিই আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের বিশেষ গুণ। তাঁদের মধ্যে চরম দীনতা ও বিনয় ছিল। আর সর্বোপরি এই গুণটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

তাঁর এক খাদেমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'তিনি তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন?

আমি বললাম, 'অর্ধেক?' করেন?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'সত্য কথা হলো, তিনি আমার যতটা সেবা করেন, আমি তাঁর ততটা সেবা করি না। আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।'

এটাই সর্বোচ্চ নৈতিকতা ও দীনতার দৃষ্টান্ত। আর এটাও সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তিরাই সেই খাদেম, যারা সর্বদা তাঁর আশেপাশে থাকে। তাই যদি কেউ বিনয়, দীনতা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের বাস্তব উদাহরণ দেখতে চায়, তবে তা তাদের থেকেই জানা যেতে পারে। কিছু পুরুষ বা নারী এমনও আছে যে, কোনো খাদেম সেবার ক্ষেত্রে সামান্য ভুল করলেই-যেমন চায়ে সামান্য ত্রুটি থাকলে-সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল শুরু করে দেয় অথবা চাবুক দিয়ে মারতে শুরু করে। আর তরকারিতে যদি একটু বেশি লবণ হয়ে যায়, তবে অসহায় খাদেমদের ওপর বিপদ নেমে আসে।

গরিবদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার এমন যে, তারা নিজেরা অনাহারে থাকে এবং শুকনো রুটি খেয়ে জীবন কাটায়; কিন্তু এসব লোক তা জেনেও তাদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। যখন তারা ভিক্ষুকের বেশে আসে, তখন এরা তাদের পরীক্ষা নেয়।"

যখন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি কোনো ধনীর কাছে সাহায্য চাইতে আসে, তখন সে আসলে সেই ধনী ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলে। প্রকৃত নেকি হলো তাদের প্রয়োজন পূরণ করা।

"আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কণার স্রষ্টা। তাঁর সঙ্গে কেউ প্রতিযোগিতা করতে পারে না। একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি আছে কি না, বা কতখানি আছে, কিংবা আল্লাহভীতি থেকে সে কত দূরে, তা প্রকৃতপক্ষে গরিবদের সঙ্গে তার আচরণ থেকেই বোঝা যায়।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১২-৩১৩, ২০২২ সংস্করণ)

একজন মানুষের মধ্যে কতখানি তাকওয়া রয়েছে, তা গরিবদের সঙ্গে তার আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ধনীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার মাধ্যমে তা বোঝা যায় না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা ও সুন্নাহ অনুসারে চলার এবং বিনয় ও নম্রতার গুণাবলি গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

নামাজের পর আমি সম্মানিত মালিক দাউদ মাহমুদ সাহেব, পিতা মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব, মূলত ভেহারী এবং বর্তমানে করাচি নিবাসী, তাঁর গায়েবানা জানাজার নামাজও পড়াব। তিনি কয়েক দিন আগে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি একজন মূসী ছিলেন। তাঁর দাদা মুহাম্মদ দীন সাহেব সিয়ালকোট জেলার বারহতানওয়ালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। মালিক দাউদ সাহেব স্থানীয় জামাতের সভাপতি, অর্থ সম্পাদক এবং আনসারুল্লাহর বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

তিনি তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে গেছেন। তাঁর এক পুত্র, মুহাম্মদ আকমল সাহেব, জামাতের একজন মুবাল্লিগ। তিনি বর্তমানে গাম্বিয়ায় কর্মরত আছেন এবং সেখানে দায়িত্ব পালন করছেন। মাঠে দায়িত্বে থাকার কারণে তিনি তাঁর পিতার জানাজায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। এই আকমল সাহেব, যিনি একজন মুবাল্লিগ, লিখেছেন যে, তাঁর পিতা ছিলেন অত্যন্ত হাসিখুশি, প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত একজন মানুষ। তাঁর মধ্যে তাবলিগের প্রবল উদ্দীপনা ছিল। তিনি যখনই সিন্ধে তাঁর জমিজমায় যেতেন, তখনও তাবলিগের সুযোগ খুঁজে বের করতেন। তিনি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতেন। পাকিস্তানে কঠোর আইন প্রণীত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সর্বদা নিজের সঙ্গে তাবলিগি লিফলেট রাখতেন এবং নিয়মিত তাবলিগ করতেন। এর ফলে অনেক মানুষ তাঁর প্রভাবে আসত। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। কেন্দ্রীয় অতিথি হোক বা অন্য যে কোনো অতিথি-সবারই আপ্যায়ন করতেন। নামাজ কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার আগে তিনি নিজের বাড়িতেই একটি নামাজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে জামাতে নামাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা হয়, ফজরের নামাজের পর তিনি অত্যন্ত উচ্চস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রে অন্য জামাতের লোকেরাও জুমার নামাজ আদায় করতে আসত। তিনি যখন নিজের ক্ষেত-খামারে যেতেন, তখন বলতেন, "আমি আমার ক্ষেতগুলোতে যাই এবং প্রতিটি কোণায় নফল নামাজ আদায় করি। এর ফলে আল্লাহ তাআলা আমার ফসলে বরকত দান করেন এবং তা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়।"

একইভাবে, তিনি তাঁর গ্রামে যে বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে সন্তানদের বলেছিলেন, "আমি চাই এই পুরো বাড়িটি স্থায়ীভাবে জামাতকে দিয়ে দিতে, যাতে এটি জামাতের কেন্দ্র হয়ে যায়।" পরে তিনি বাস্তবেই সেটি জামাতকে দান করে দেন।

যাইহোক, অতিথিপরায়ণতা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান গুণ। মানুষের সেবা করা, জামাতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং নিয়মিত খুতবা শোনা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও দয়া বর্ষণ করুন। (আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০২৬, পৃষ্ঠা ২-৮)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিযকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

১ম খুতবার শেষাংশ......

তারপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কেউ এর অংশ লাভ করে এবং কোনো সময়ে সে যদি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে আর বক্ষ উন্মোচিত হয়, তবে সে যেন অহংকার ও গর্ব না করে; বরং তার বিনয় ও নম্রতা যেন আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ মানুষ যতটা নিজেকে'আমি কিছু নই' বলে মনে করবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তত বেশি আধ্যাত্মিক আনন্দ ও ঐশী জ্যোতি বর্ষিত হবে যা তাকে আলো ও শক্তি জোগাবে। মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তার চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। নিজেকে পৃথিবীতে কিছু মনে করাও এক ধরনের অহংকার, আর তখন মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যকে অভিশাপ দেয় আর তুচ্ছ জ্ঞান করে।"(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৯-৬০)

এরপর তিনি বলেন, মানুষ- যে এক দুর্বল সৃষ্টি- নিজের কর্ম দোষে নিজেকে বড়োমনে করতে শুরু করে এবং তার মধ্যে অহংকার ও ঔদ্ধত্য চলে আসে। আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেকে যতক্ষণ সবার চেয়ে ছোটো মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুক্তি পেতে পারে না। ভারতের একজন সুফি কবি 'কবীর ভগত' সত্যই বলেছেন:ভালা হুয়া হাম নীচ ভালে হার কো কিয়া সালাম,জে হোতে ঘর উঁচ কে মিলতা কাহাঁ ভগবান?

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করছি যে, আমরা ছোটোঘরে জন্মেছি; যদি উঁচুবংশে জন্মাতাম, তবে হয়ত খোদার দেখা পেতাম না। লোকেরা যেখানে নিজেদের উঁচুবংশ নিয়ে গর্ব করত, কবীর সেখানে তাঁতির বংশে জন্ম নেবার কারণে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন।

অতএব, মানুষের উচিত প্রতিটি মুহূর্তে নিজের দিকে তাকানো এবং একথা ভাবা যে, আমি কত-না তুচ্ছ! আমার অস্তিত্বই বা কী? একজন মানুষ যতই উচ্চ বংশের হোক না কেন, সে যদি আত্মবিশ্লেষণ করে, যদি চোখ থাকে- তাহলে সকল ক্ষেত্রে কোনো না কোনো দিক থেকে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে নিজেকে অবশ্যই অযোগ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করবে।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেই একই উত্তম আচরণ না করবে যা সে একজন উচ্চ বংশীয় ও প্রভাবশালী মানুষের সাথে করে বা করা উচিত, এবং যতক্ষণ না সে নিজেকে সব ধরনের অহংকার, ঔদ্ধত্য ও দম্ভ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে-ততক্ষণ সে কোনো অবস্থাতেই ঐশী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩৮)

আল্লাহ্‌কে পেতে হলে বিনয় ও নম্রতা একটি অপরিহার্য শর্ত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনয়ের তাৎপর্য এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন

(আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ৫জুন, ২০২৬)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

দুইশতবার দরুদ শরীফ

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ

اَللّٰھم صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিন্মোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

৬০। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমার শ্রদ্ধেয় মা (হযরত আম্মা জান) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা যখন ছোট ছিলে এবং সম্ভবত দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তে, একবার প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) প্রয়োজন সেরে ফিরে এলেন। সে সময় তুমি একটি খাটের ওপর লাফালাফি করছিলে এবং ডিগবাজি খাচ্ছিলে। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তা দেখে হাসলেন এবং বললেন, "দেখো তো, সে কী করছে!"তারপর বললেন, "একে এম.এ. পড়িও।"

বিনীত নিবেদন এই যে, কথাটি সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গিতে হঠাৎই উচ্চারিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর মধ্যে দুই-তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে।

৬১। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমার শ্রদ্ধেয় মা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, রাতে ঘুমানোর আগে তিনি সবসময় তাঁর পায়জামা খুলে তাহবন্দ পরতেন। সাধারণত তিনি তাঁর কুর্তাও খুলে ঘুমাতেন।

বিনীত নিবেদন এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্জনের কাজ শেষ করলে প্রথমে মাটি দিয়ে নিজের হাত ঘষতেন, তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নিতেন।

৬২। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বিনীত নিবেদন এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) মাঝে মাঝে বাড়ির শিশুদের গল্প শোনাতেন। যেমন, তিনি প্রায়ই একজন দুষ্ট লোক এবং একজন সৎ লোকের গল্প বলতেন। এর সারমর্ম ছিল এই যে, একজন ছিল দুষ্ট এবং একজন ছিল সৎ। উভয়েই নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করল এবং শেষ পর্যন্ত দুষ্ট লোকের পরিণতি হলো মন্দ, আর সৎ লোকের পরিণতি হলো উত্তম।

মা বলতেন, তিনি বেগুনের একটি গল্পও বলতেন। এর সারমর্ম ছিল এই যে, একজন প্রভু তাঁর ভৃত্যের সামনে বেগুনের খুব প্রশংসা করলেন। ভৃত্যও বেগুনের অনেক প্রশংসা করল। কয়েক দিন পরে সেই প্রভু বেগুনের সমালোচনা করলেন, তখন ভৃত্যও সমালোচনা শুরু করল। প্রভু বললেন, "এ কী ব্যাপার? সেদিন তো তুমি এর প্রশংসা করছিলে, আজ আবার সমালোচনা করছ?"ভৃত্য উত্তর দিল, "আমি তো আপনার দাস, বেগুনের দাস নই।"

৬৩। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বিনীত নিবেদন এই যে, একবার আমরা তিন ভাই মিলে একটি এয়ারগান অর্ডার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কোনটি অর্ডার করব, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা কাগজের টুকরোয় নাম লিখে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে লট তুলতে বললাম। যে বন্দুকটির নাম উঠল, সেটিই আমরা অর্ডার করলাম। পরে সেটি দিয়ে আমরা অনেক শিকার করেছি। (এটি ছিল .২২ বোরের বি.এস.এ. এয়ার রাইফেল।)

৬৪। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বিনীত নিবেদন এই যে, একবার বাড়ির সব শিশু মিলে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সামনে মিয়াঁ শরীফ আহমদকে উত্যক্ত করতে শুরু করল। আমরা বলছিলাম, "আব্বা তোমাকে ভালোবাসেন না, তিনি আমাদের ভালোবাসেন।" মিয়াঁ শরীফ এতে খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আমাদের থামিয়ে বললেন, তাকে বেশি বিরক্ত করো না। কিন্তু আমরা তো শিশু ছিলাম, তাই থামিনি। শেষ পর্যন্ত মিয়াঁ শরীফ কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি কাঁদলে নাক দিয়ে অনেক সর্দি বের হতো।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) উঠে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিতে চাইলেন, যেন তাঁর মনে এই ধারণা দূর হয় যে তাঁকে ভালোবাসা হয় না। কিন্তু নাক দিয়ে সর্দি পড়ছিল বলে মিয়াঁ শরীফ বারবার সরে যাচ্ছিলেন। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) মনে করলেন, হয়তো তাঁর কোনো ব্যথা হচ্ছে, তাই তিনি সরে যাচ্ছেন। এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকল-প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তাঁকে নিজের দিকে টানছিলেন, আর তিনি সরে যাচ্ছিলেন। আর আমরা যেহেতু আসল কারণ জানতাম, তাই পাশে দাঁড়িয়ে হেসেই যাচ্ছিলাম।

৬৫। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা যখন শিশু ছিলাম, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কোনো কাজে ব্যস্ত থাকুন বা যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম, "আব্বা, আমাকে টাকা দিন।" তখন তিনি তাঁর রুমাল খুলে আমাদের টাকা দিতেন। কোনো সময় আমরা যদি কোনো বিষয়ে খুব বেশি জেদ করতাম, তখন তিনি বলতেন, "মিয়াঁ, আমি এখন কাজ করছি, আমাকে বেশি বিরক্ত করো না।"

বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি বড় আকারের মসলিনের তৈরি একটি রুমালে নগদ অর্থ ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বেঁধে রাখতেন। রুমালের অন্য প্রান্তটি তিনি তাঁর ওয়েস্টকোটে সেলাই করে রাখতেন অথবা বোতামের ছিদ্রে আটকে রাখতেন। তিনি তাঁর চাবিগুলো আজারবন্দের (ধুতি) সঙ্গে বেঁধে রাখতেন, যা কখনো কখনো ওজনের কারণে নিচের দিকে ঝুলে পড়ত।

মা বর্ণনা করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সাধারণত রেশমের আজারবন্দ (ধুতি)ব্যবহার করতেন, কারণ তাঁর ঘন ঘন প্রস্রাবের প্রয়োজন হতো। তাই তিনি রেশমের আজারবন্দ (ধুতি) ব্যবহার করতেন, যাতে সহজে খুলে ফেলা যায় এবং যদি গিঁটও পড়ে, তবে তা খুলতে অসুবিধা না হয়। কখনো কখনো সুতির আজারবন্দে (ধুতি) গিঁট পড়ে যেত এবং তখন তিনি খুব কষ্টে পড়তেন।

৬৬। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমার শ্রদ্ধেয় মা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমার দাদার জীবদ্দশায় একবার প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং টানা ছয় মাস অসুস্থ ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর বেঁচে থাকার আশা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। একবার প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর চাচা এসে তাঁর পাশে বসে বললেন, "এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম। প্রত্যেককেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেউ আগে যায়, কেউ পরে। তাই এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।"

মা বলতেন, তোমার দাদাই নিজে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর চিকিৎসা করতেন এবং টানা পূর্ণ ছয় মাস তাঁকে ছাগলের পায়ের নলির ঝোল খাওয়াতেন।

বিনীত নিবেদন এই যে, এখানে 'চাচা' বলতে মির্জা গুলাম মুহিউদ্দীন সাহেবকে বোঝানো হয়েছে।

৬৭। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমাদের ফুফু সাহিবা, অর্থাৎ মির্জা ইমামউদ্দীন সাহেবের বোন এবং আমাদের তাই সাহিবার ছোট বোন, যিনি হোশিয়ারপুরের মির্জা আহমদ বেগ সাহেবের বিধবা ছিলেন, তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার শিখরা আমাদের পিতা এবং আমাদের তাই সাহিবাকে বসরাঁও দুর্গে বন্দি করেছিল এবং তাদের হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।

বিনীত নিবেদন এই যে, ঘটনাটি সম্ভবত শিখ শাসনের শেষ সময়কার, যখন মহারাজা রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর দেশে আবার অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায়, সে সময় শিখরা আমাদের দাদা এবং তাঁর ভাই মির্জা গুলাম মুহিউদ্দীন সাহেবকেও ওই দুর্গে বন্দি করেছিল। আরও জানা যায়, তাঁদের ছোট ভাই মির্জা গুলাম হায়দার যখন এ সংবাদ পান, তখন তিনি লাহোর থেকে সাহায্য নিয়ে এসে তাঁদের মুক্ত করেন।

বিনীত নিবেদন এই যে, বসরাঁও কাদিয়ানের পূর্ব দিকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। সে সময় সেখানে একটি মাটির দুর্গ ছিল, যা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে, যদিও তার কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

৬৮। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমার শ্রদ্ধেয় মা (হযরত আম্মা জান) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন ছোট মেয়ে ছিলাম, তখন মীর সাহেব (অর্থাৎ আমার মাতামহ)-এর একবার কাদিয়ানে বদলি হয়। আমরা সেখানে ছয় বা সাত মাস ছিলাম। এরপর মীর সাহেবের অন্যত্র বদলি হয়। তিনি তোমাদের তাই সাহিবার সঙ্গে কথা বলে আমাদের তাঁর বাড়িতে রেখে যান। প্রায় এক মাস পর তিনি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যান। সে সময় তোমাদের তাই সাহিবা কাদিয়ানের বাইরে থাকতেন এবং প্রতি আট দিন অন্তর এখানে আসতেন। তাঁকে আমি দেখেছি বলে আমার মনে আছে।

বিনীত নিবেদনকারী জিজ্ঞাসা করলেন, "সে সময় কি আপনি কখনো হযরত (প্রতিশ্রুত মসীহ)-কে দেখেছিলেন?

মা উত্তর দিলেন, "হযরত একই বাড়িতে থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখিনি।" মা আমাকে সেই কক্ষটি দেখিয়েছিলেন, যেখানে সে সময় হযরত থাকতেন। বর্তমানে সেই কক্ষটি মির্জা সুলতান আহমদ সাহেবের অধিকারে রয়েছে।

বিনীত নিবেদন এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) শুরু থেকেই নির্জন জীবনযাপন করতেন। তাই মা তাঁকে দেখার সুযোগ পাননি।

বিনীত নিবেদনকারী মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কখনকার ঘটনা?চ

মা বললেন, "সঠিক তারিখ মনে নেই। তবে মনে আছে, আমরা যখন কাদিয়ানে এসেছিলাম, তখন তোমার দাদার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী সদ্য পালিত হয়েছিল।"

বিনীত নিবেদন এই যে, এ হিসাবে সময় দাঁড়ায় ১৮৭৭ সাল। সে সময় মায়ের বয়স ছিল নয় বা দশ বছর এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর বয়স সম্ভবত চল্লিশ বছরেরও বেশি ছিল।

(বিনীত নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের সময় যে কক্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সে সময় থাকতেন, অন্য একটি কক্ষের বিনিময়ে সেটি আমাদের অধিকারে এসেছে। সেটি হলো বর্তমান হযরত আম্মা জানের রান্নাঘরের আঙিনার সংলগ্ন উপরের তলার সেই কক্ষ, যা মরহুম মির্জা সুলতান আহমদ সাহেবের বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত।)

অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ বলেন: হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যে সেই তাকওয়া (ধার্মিকতা) তৈরি করেছিলেন যা প্রতিশ্রুত মসিহ (আলাইহিস সালাম) বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই তাঁরা "আমরা শুনলাম এবং আমরা মেনে চললাম"(সামি'না ওয়া আত্বা'না)-এর একটি নিখুঁত উদাহরণ উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁরা পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান (মা'রিফাত) লাভ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁরা ভালোবাসার নিখুঁত উদাহরণ প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের প্রতি তাঁদের পূর্ণ ভালোবাসা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তা মদের নেশাকেও জয় করেছিল। এই ভালোবাসা মদের নেশার উপর বিজয়ী হয়েছিল এবং তাঁরা প্রথমে নিজেদের মদের পাত্র ভেঙে ফেলেছিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই নির্দেশ কি তাঁদের উপর প্রযোজ্য নাকি অন্যদের উপর, অথবা নির্দেশের প্রকৃত স্বরূপ কী।

হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ আরও বলেন: অতএব, এই আত্মাকে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে। যখন এই আত্মা বিকশিত হয়, তখন তা একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ মানের ত্যাগের যোগ্য করে তোলে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভকারী বানায়। ঈদুল আযহার আত্মা আবার আমাদের হৃদয়ে এই উপলব্ধি জাগ্রত করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র বানায়। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই মর্যাদা লাভ করা যায় না যদি না সর্বদা এই চিন্তা সামনে রাখা হয় যে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি কাজ দেখছেন। যদি প্রতিটি কাজ এই সচেতনতার সাথে, আল্লাহর জন্য এবং এই ভয়ের সাথে করা হয় যে তিনি প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন, তাহলে প্রতিটি দিনই ত্যাগের পুরস্কারের যোগ্য হয়ে ওঠে।

হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ বলেন: সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা করা। আমাদের আল্লাহর ভয় এবং ভালোবাসার জ্ঞান অনুসন্ধান করা উচিত। আমাদের সেই সত্যিকারের ঈদ উদযাপনের চেষ্টা করা উচিত - এমন ঈদ যা আমাদের জীবন, সম্পদ, সময় এবং সম্মান উৎসর্গ করার অঙ্গীকারের বাস্তবতাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। আমাদের প্রতিটি ঈদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। যদি এই মানসিকতা বিকশিত হয়, তাহলে ঈদ শুধু বছরে একবার আসবে না। এটি শুধু পশু জবাই করে আনন্দ প্রকাশের উপলক্ষ বা নিজের পশু থেকে কত কেজি মাংস পাওয়া গেছে তা নিয়ে গর্ব করার উপলক্ষ হবে না। বরং এটি সত্যিকারের ঈদ হয়ে উঠবে যা সকল বাহ্যিক প্রদর্শনের উর্ধ্বে উঠবে। এটি প্রতিদিনের ঈদ হয়ে উঠবে এবং ইনশাআল্লাহ, প্রতিটি নতুন দিন যা আমাদের উপর উদিত হয় তা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই সত্যিকারের ঈদ উদযাপন করার তাওফীক দান করুন এবং বারবার তাঁর বরকতের উত্তরাধিকারী বানান। আর এই বরকত শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকুক, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে থাকুক, তাঁর দয়া ও বরকত থেকে উপকৃত হতে থাকুক এবং তাঁর ঐশী পুরস্কারে অংশীদার হতে থাকুক। আল্লাহ এমনটি করুন।

এরপর হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ বলেন: এখন জুমার খুতবার দ্বিতীয় অংশের পর আমরা নামাজ আদায় করব। এই নামাজে আমাদের সকল শহীদদের কথা স্মরণ করুন এবং প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মর্যাদা উন্নত করেন। তাঁদের প্রিয়জনদের জন্যও প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তাঁদেরকে ধৈর্য ও অবিচলতা দান করেন। পাকিস্তান ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বন্দি আমাদের সকল সদস্যদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তাঁদের মুক্তির উপায় সৃষ্টি করেন। প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ আমাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তির উপায় প্রদান করেন, যা শুধুমাত্র আমরা আহমদী হওয়ার কারণে দায়ের করা হয়েছে।

হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ আরও বলেন: যারা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের পুরস্কৃত করেন এবং তাঁদের সম্পদ ও জীবন বরকতময় করেন। প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ যেকোনো আকারে ত্যাগকারী প্রত্যেকের ত্যাগ কবুল করেন। বিশ্বজুড়ে সেবারত সকল ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য প্রার্থনা করুন, বিশেষ করে যাঁরা অবিচল থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন সেসব অঞ্চলে যেখানে বিরোধিতার তীব্র ঢেউ চলছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের জামাতের জন্য প্রার্থনা করুন। আমি পূর্বেও একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, সেখানকার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। তবে যখন বিষয়গুলো চরমে পৌঁছে, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির উপায়ও সৃষ্টি করেন। আল্লাহ শীঘ্রই সেই উপায় সৃষ্টি করুন। শুধু পাকিস্তান নয়, অন্যান্য দেশেও বিরোধিতা রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় কিছু অঞ্চলে বিরোধিতা অত্যন্ত তীব্র। কিছু আহমদী শুধুমাত্র আহমদী হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে গৃহহীন রয়েছেন। প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় প্রদান করেন। যেখানেই জামাতের বিরুদ্ধে বিরোধিতা রয়েছে এবং আহমদীরা কষ্টে আছেন, সেখানে প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকল কষ্ট দূর করে দেন। এর সাথে সাথে আপনাদের সকলকে ঈদ মুবারক। এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল আহমদীদেরও ঈদ মুবারক। আল্লাহ তা'আলা এই ঈদকে আমাদের সকলের জন্য অপরিমেয় বরকতের উৎস বানিয়ে দিন।

এরপর হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ জুমার খুতবার দ্বিতীয় অংশ প্রদান করেন এবং জামাতকে নিয়ে দোয়া পরিচালনা করেন।

এরপর হুজুর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ মসজিদের উপরের তলায় যান এবং সেখানে উপস্থিতদেরকে "আসসালামু আলাইকুম"বলে অভিবাদন জানান। তারপর তিনি মহিলা হল এবং মার্কিতে যান, সেখানেও মহিলাদেরকে "আসসালামু আলাইকুম"বলে অভিবাদন জানান এবং মহিলারা তাঁদের প্রিয় ইমামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) এমটিএ স্টুডিওতে আসেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ঈদের খুতবার পরপরই হুজুরের এই সংক্ষিপ্ত সফর সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল।

নিজ বাসভবনে ফেরার আগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) সৌজন্যবশত অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত আমীর সাহেব, নায়েবে উমারা (উপ-আমীরগণ), সফরসঙ্গীদের সদস্যবৃন্দ, খুদ্দামুল আহমদীয়্যা অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল সদর এবং ডিউটিতে থাকা খুদ্দামদের সাথে হাত মিলিয়ে সম্মানিত করেন, তাঁদেরকে বিদায় দেন এবং তারপর নিজ বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

সিডনি জামাতের পাশাপাশি ব্রিসবেন, মেলবোর্ন এবং অ্যাডিলেইডসহ অন্যান্য জামাতের অনেক সদস্য দূর-দূরান্ত থেকে সিডনিতে এসেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্? আল খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা)-এর পেছনে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য। তাঁর নেতৃত্বে দুই হাজার পাঁচশতেরও অধিক সদস্য ঈদের নামাজ আদায় করেন এবং অল্প কয়েকজন বাদে সকলের জন্য এটি ছিল হুজুরের পেছনে প্রথম ঈদের নামাজ। সকলে এই বরকতময় সুযোগে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং অনেকে মন্তব্য করেন যে, মনে হচ্ছিল একসাথে একাধিক ঈদ উদযাপন করছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের জন্য এই ঈদকে চিরস্থায়ী বরকতের উৎস বানিয়ে দিন। আমীন।

দুপুর ১:৩০ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) যোহর ও আসরের যৌথ নামাজের ইমামতি করেন। নামাজের পর হুজুর নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

গেস্ট হাউজ ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

দিনের কর্মসূচি অনুসারে গেস্ট হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই তলা বিশিষ্ট গেস্ট হাউজটি বাইতুল হুদা মসজিদের বাইরের অংশের একটি জায়গায় নির্মিত হওয়ার কথা ছিল।

বিকেল ৬:৪০ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্? আল খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে অনেক আহমদী পুরুষ ও মহিলা সমবেত হয়েছিলেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ার আহমদীয়্যা মুসলিম জামাতের মিশনারি সম্মানিত ইমতিয়াজ আহমদ সাহেবের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্? আল খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) প্রথম ভিত্তি ইট স্থাপন করেন। তারপর হযরত বেগম সাহেবা (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) দ্বিতীয় ইট স্থাপন করেন।

এরপর নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকে একটি করে ভিত্তি ইট স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করেন, নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে:

সম্মানিত মাহমুদ আহমদ সাহেব, আমীর ও মিশনারি ইন-চার্জ, অস্ট্রেলিয়া
আব্দুল মজিদ তাহির সাহেব, এডিশিনাল ওয়াকিলুত তাবশীর, লন্ডন
মুনীর আহমদ জাভেদ সাহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারি
মুবারক আহমদ জাফর সাহেব, এডিশিনাল ওয়াকিলুল মাল, লন্ডন
চৌধুরী খালিদ সাইফুল্লাহ খান সাহেব, নায়েব আমীর, অস্ট্রেলিয়া
নাসির মাহমুদ কাহলোন সাহেব, নায়েব আমীর, অস্ট্রেলিয়া
আজিজ দ্বীন সাহেব, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মজলিসে আমিলার সদস্য
রানা মুহাম্মদ আমজাদ খান সাহেব, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মজলিসে আমিলার সদস্য
মুহাম্মদ আমজাদ খান সাহেব, ন্যাশনাল সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ।

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 9-16 July, 2026 Issue No.28-29

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্য বশীর আহমদ এম.এ.(রা.)

আসহাবে ফীল (হাতিওয়ালাদের ঘটনা)

আবদুল মুত্তালিবের সময় ইয়েমেন অঞ্চল আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া)-এর অধীন ছিল। সে সময় আবিসিনিয়া ছিল একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য। যেহেতু আবিসিনিয়া একটি খ্রিষ্টান দেশ ছিল, তাই ইয়েমেনের শাসকও ছিলেন একজন খ্রিষ্টান। আবদুল মুত্তালিবের সময় ইয়েমেনের শাসকের নাম ছিল আবরাহা আল-আশরাম। এই ব্যক্তি কাবার প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করত এবং যেকোনো উপায়ে আরবদের কাবা থেকে বিমুখ করতে চাইত।

এই উদ্দেশ্যে সে ইয়েমেনে কাবার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করে এবং মানুষকে উৎসাহিত করতে থাকে যাতে তারা কাবার পরিবর্তে ওই উপাসনালয়ে হজ করতে যায়। আরবদের স্বভাব এমন ছিল যে, আরব উপদ্বীপে কাবার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অন্য কোনো উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা তারা সহ্য করতে পারেনি। বর্ণনায় আছে, এক আরব ব্যক্তি ক্রোধে সেই গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে মলত্যাগ করে। আবরাহা এ সংবাদ পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় গিয়ে কাবা ধ্বংস করার সংকল্প করে।

সে আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশির অনুমতি নিয়ে ইয়েমেন থেকে এক বিশাল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীসহ রওনা হয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী এই বাহিনীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার পর্যন্ত, তবে যাই হোক, এতে হাজার হাজার সৈন্য ছিল। পথে বিভিন্ন আরব গোত্রকে পরাজিত করে সে মক্কার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে এবং শহরের সামনে তার সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপন করে।

কুরাইশরা এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কারণ তারা জানত যে এই বাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। তাই তারা প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার কাছে পাঠায়। আবদুল মুত্তালিবের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা আবরাহার মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং সে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে। এরপর সে তার দোভাষীকে নির্দেশ দেয়, তিনি কী চান তা জিজ্ঞাসা করতে। আবদুল মুত্তালিব, যিনি সম্ভবত আগেই কথোপকথনের ধরন নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, বললেন, "তোমার সৈন্যরা আমার উটগুলো নিয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

আবরাহা উটগুলো ফিরিয়ে দিলেও আবদুল মুত্তালিবের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে তার যে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তা মুছে গেল। সে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "আমি তোমাদের কাবা ধ্বংস করতে এসেছি, আর তুমি তার জন্য কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না করে তোমার উট নিয়ে চিন্তিত!

আবদুল মুত্তালিব নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তো উটগুলোর মালিক, তাই সেগুলোর জন্যই চিন্তিত। কিন্তু এই ঘরেরও একজন মালিক আছেন; তিনিই একে রক্ষা করবেন।"

এই উত্তর শুনে আবরাহা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "আচ্ছা, তাহলে আমি দেখব এই ঘরের মালিক কীভাবে আমাকে একে ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখেন।"

এরপর সে তার সৈন্যবাহিনী ও হাতি নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা হলো যে, আবরাহা যে হাতিতে আরোহী ছিল, সেটির মুখ মক্কার দিকে ঘোরানো মাত্র এবং তাকে যতই সামনে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করা হলো, সে আর এক কদমও এগোল না। এরপর সেই বাহিনীর ওপর এমন এক বিপর্যয় নেমে এলো যে পুরো সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল এবং পাখিদের খাদ্যে পরিণত হলো।

বর্ণনাগুলোতে এই ঘটনার বিস্তারিত এভাবে এসেছে যে, যখন এই বাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হতে চাইল, তখন আল্লাহর নির্দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তাদের ওপর এসে উপস্থিত হলো। তাদের নখরে পোড়ামাটির ছোট ছোট কণা বা পাথর ছিল। যেসব সৈন্যের ওপর এই কণাগুলো পড়ত, তারা গুটিবসন্তের মতো এক মারাত্মক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ত। একবার এই রোগ সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়লে তা দ্রুত একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমিত হতে থাকে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ সংক্রামক রোগ প্রায়ই ধূলিকণা বা অন্য উপায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এমনও হতে পারে যে, এই পাখিগুলো এমন কোনো স্থান থেকে এসেছিল যেখানে সংক্রামক রোগের জীবাণু ছিল, এবং তাদের মাধ্যমে গুটিবসন্তের মতো একটি প্রাণঘাতী রোগ পুরো বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবরাহা এমন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল যাতে তার শরীরের মাংস টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে-

"তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন, যারা তাদের ওপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদের এমন করে দিলেন, যেমন চিবিয়ে খাওয়া খড়কুটো।" (সূরা আল-ফীল)

ইতিহাসে আবরাহার এই আক্রমণ 'আসহাবে ফীলের আক্রমণ' নামে পরিচিত। কারণ আবরাহার বাহিনীতে একটি হাতি ছিল, অথবা কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী একাধিক হাতি ছিল। হাতি ছিল মক্কার কুরাইশদের কাছে একেবারেই নতুন ও অদেখা প্রাণী। তাই তারা শুধু আক্রমণকারীদেরই 'আসহাবে ফীল' নামে অভিহিত করেনি, বরং সেই বছরটির নামও দিয়েছিল 'আমুল ফীল' বা 'হাতির বছর'।

আসহাবে ফীলের ধ্বংসের ফলে কাবার মর্যাদা এবং কুরাইশদের সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়। আরবের অন্যান্য গোত্র তাদের প্রতি আগের তুলনায় আরও বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে।

২পাতার পর......

আহাদীসে দুরূদ শরীফের অপরিসীম ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন:

"আমি পবিত্র নবী (সা.)-এর দরবারে আরজ করলাম, 'আমি আপনার উপর প্রচুর দরূদ পাঠ করি। আমার দোয়ার কতটুকু অংশ আপনার উপর দরূদ পাঠে নির্ধারিত করব?'

তিনি বললেন, 'যতটুকু ইচ্ছা।'

আমি বললাম, 'এক চতুর্থাংশ?'

তিনি বললেন, 'যতটুকু ইচ্ছা, তবে বাড়ালে তোমার জন্য উত্তম হবে।'

আমি বললাম, 'অর্ধেক?'

তিনি বললেন, 'যতটুকু ইচ্ছা, তবে বাড়ালে তোমার জন্য উত্তম হবে।'

আমি বললাম, 'দুই তৃতীয়াংশ?'

তিনি বললেন, 'যতটুকু ইচ্ছা, তবে বাড়ালে তোমার জন্য উত্তম হবে।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমি আমার সমস্ত দোয়াই আপনার উপর দরূদ পাঠে উৎসর্গ করে দেব।'

মহানবী (সা.) বললেন, 'তাহলে তোমার দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

(সুনানুত তিরমিযী, কিয়ামত দিবসের বর্ণনা, অন্তরের কোমলতা ও যুহদ অধ্যায়)।

দুরূদ শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"একবার এমন হয়েছিল যে, আমি দুরূদ শরীফ অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠে দীর্ঘক্ষণ গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়ি, কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছানোর পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মহা নবী (সা.)-এর মধ্যস্থতা ব্যতীত তা লাভ করা সম্ভব নয়, যেমন আল্লাহ্ নিজেই বলেন: 'তাঁর নিকট পৌঁছানোর উপায় অনুসন্ধান করো।' (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩৬)।

কিছুক্ষণ পর দর্শনের অবস্থায় আমি দেখলাম, দুজন পানিবাহক আমার ঘরে প্রবেশ করছে - একজন অভ্যন্তরীণ পথ দিয়ে, অন্যজন বাহ্যিক পথ দিয়ে। তাদের কাঁধে আলোকোজ্জ্বল মশক ছিল এবং তারা বলছিল:

'হাযা বিমা সাল্লাইতা আলা মুহাম্মাদ' -

'এটি এজন্য যে তুমি মুহাম্মদের উপর দরূদ পাঠ করেছ।'

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ১৩১, পাদটীকা)।

দুরূদ শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমি পবিত্র কুরআন, পবিত্র নবী (সা.)-এর আহাদীস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আলাইহিস সালাম) ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর লেখনীর আলোকে অসংখ্য জুমার খুতবা ও ভাষণে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আপনি আল ফজল-এ এসব খুতবা পড়তে পারেন অথবা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট alislam.org-এ শুনতে পারেন।(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir